ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল

প্রসঙ্গ ঃ

মুসলমান সমাজে সংস্কার

গিয়াসুদ্দিন

প্রসঙ্গ ঃ মুসলমান সমাজে সংস্কার

গিয়াসুদ্দিন

অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ
কলকাতা

Prasanga : Musalman Samaje Samskar

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১
মানবাব্দ ৪০০১১
পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩

প্রকাশক : অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৭, ✆ ৯০০৭৭৩০৭৬৬
Samiran_anish@rediffmail.com

বর্ণ সংস্থাপক : আর্টিস্টিক ইম্প্রেশন
৮০/৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০ ১৩২
ফোন : ০৩৩-২৫১৮ ৮৮৮০

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান

১। **বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র**
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ফোন : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

২। **বারাসাত রেলওয়ে বুক স্টল (২-৩ নং প্লাটফরম)**
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন : ৮৬৯৭২৫৬৮৪৭

৩। **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ**
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৩, ফোন : ০৩৪-৮২২৬৪২৫৩

৪। **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ**
রায়গঞ্জ, প. দিনাজপুর, পিন ৭৩৩১৩৪

৫। **শ্রীচঞ্চল দেবনাথ**
নতুন পুকুর, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৪, ফোন : ৯৮৩৬২৬৮১৪৩

৬। **অ্যাডভোকেট তপন বিশ্বাস, সম্পাদক, 'ওম গাণ্ডীব'**
মালিপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৫১৩, ফোন : ৯৪৩৪৩০২১২৯

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র

MAHASWETA DEVI

GD-30 Rajdanga Main Road
Narkelbagan, Kolkata 700107
Phone : (033) 2441-0408

সুলেখক গিয়াসুদ্দিন রচিত
"প্রসঙ্গ : মুসলমান সমাজে সংস্কার"
একটি মূল্যবান এবং কাছে রাখার মতো বই।
যথেষ্ট সুলিখিত এবং চিন্তা উদ্রেককারী।

বইটিকে স্বাগত জানাই। আশা করি, বইটি
বহুল প্রচারিত হবে। গিয়াসুদ্দিনকে এবং
প্রকাশককে অজস্র ধন্যবাদ।

মহাশ্বেতা দেবী

ভূ মি কা

সংস্কার অর্থই হল ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কারের সংস্কার, সেই কুসংস্কারেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে ধর্মের সাথে। কাজেই সংস্কার চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংহিতা আলোচনার সামনে এসে দাঁড়ায়, অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি নিষেধগুলির পর্যালোচনা ছাড়া সংস্কার চিন্তা অগ্রসর হতে পারে না। কোন কিছু অনড়, অপরিবর্তনীয় মনে করলে সংস্কার হতে পারে না। মুসলমান সমাজে সংস্কার তাই স্বভাবতই কোরান হাদিস শরিয়ৎ কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়ায়।

গিয়াসুদ্দিন সেই পথ ধরেই তাঁর সংস্কার আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যালোচনার ক্ষমতা। প্রতিটি উৎস গ্রন্থ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বক্তব্য চয়ন করেছেন। এবং কী ভাবে সংস্কার ধারা মুসলমান সমাজে প্রবাহিত হয়েছে তার দিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। অল্প মন্তব্যে, বেশি তথ্যে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে অনীশ মুক্তচিন্তা সম্মেলনে গিয়াসুদ্দিন যে ভাষণটি দিয়েছিলেন এটি তারই পরিমার্জিত রূপ। সেই আলোচনা শ্রোতাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। বহু প্রশ্নের সামনে তিনি নানা সূত্র উধৃত করে জবাব দিয়েছিলেন। এই লেখাতে ছত্রে ছত্রে সেই সব সূত্রের উল্লেখ রয়েছে।

সংস্কার সব সমাজেই রক্ষণশীল মানসিকতার বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজের আচার-আচরণ অনুসরণ করেও তাকে সংস্কার হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি। খরগোসের চোখ বন্ধ করে ঝড়কে না দেখতে চাওয়ার মতোই। পৃথিবীতে একনিষ্ঠ একজন মুসলমানও নেই যিনি শতকরা একশ ভাগ তাদের ধর্মীয় বিধিনিষেধ, তাদের ধর্ম-পুস্তকের কথা অনুসরণ করে চলেন। এমনটা কোনও ধর্মের মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। সমাজ-জীবন যাপনের কিছু আচরণ স্বাভাবিক গতিতেই বদলে যায়। কিছু বদলের জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিছু পরিবর্তন প্রবল বাধা অতিক্রম করে অর্জন করতে হয়।

মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের ভূমিকা আরও সংস্কারমুখী হবার দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা তাদের জীবনযাপন সংস্কারের আলোতে বদলিয়ে অনুসরণ করেন। কিন্তু বাকি অংশের জন্য সে পথ দেখান না।

গিয়াসুদ্দিন সে কাজে এগিয়ে এসেছেন।

বইটি মুক্তমনে অধ্যয়ন করলে চেতনার পরিবর্তনে যে সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ নেই।

কলকাতা — সমীরণ মজুমদার

৪০০১১ মানবাব্দ

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

বইটির যা বিষয়বস্তু তাতে আরও একটু বিশদে আলোচনা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু বই লিখব বলে বইটি লেখা হয়নি। অনীশ সংস্কৃতি পরিষদের একটি বার্ষিক সম্মেলনে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে আমি আমন্ত্রিত হই এবং সেখানে একটি লিখিত বক্তৃতা উপস্থাপন করি। একটা বক্তৃতায় সময়ের যে সীমাবদ্ধতা থাকে সেটা খেয়ালে রেখে ক্ষুদ্র পরিসরে লেখাটা শেষ করতে হয়েছিল। সেই লেখাটাই অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ বই আকারে পরে প্রকাশ করে। ফলে মুসলিম সমাজের সংস্কার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি দিক ও আরও অনেক কথা আলোচনা করার অবকাশ থাকলেও এই বইয়ে তা করা সম্ভব হয়নি। ভেবেছিলাম দ্বিতীয় সংস্করণে সেই কথাগুলি সংযোজন করবো।

কিন্তু এত দ্রুত বইটির সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। তাই দ্বিতীয় সংস্করণের কাজও শুরু করা হয়ে ওঠেনি। এদিকে বইটির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ফলে বইটি পুনর্মুদ্রণের আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মুদ্রণে স্বভাবতই কিছু সংযোজন করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু অন্ততঃ দু'টি স্থানে একটু পরিমার্জন করা একান্ত আবশ্যক বিধায় এই কয়েকটি কথার অবতারণা। ইসলাম বহু বিবাহে উৎসাহ দেয়নি। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণের এই দাবীকে যে সর্বৈব এক মিথ্যাচার তার প্রমাণ স্বরূপ কোরানের একটি আয়াতের উল্লেখ আছে এই বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠায়। ওই আয়াতটিতে শর্ত নিহিত আছে বলে যা লেখা হয়েছে (২৫ পৃষ্ঠায়) সেখানে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের অবকাশ রয়েছে। কোরানের তফসির অনুসারে ওই শর্তটি হলো সংক্ষেপে এরকম, 'যদি কোনো পিতৃহীনা বালিকাকে লালন-পালন করার পর তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করো, কিন্তু যদি তার প্রতি সুবিচার করতে না পারার ভয় থাকে, তবে অন্যান্য নারীদের মধ্যে থেকে ২-টি, ৩-টি এবং ৪-টি বিয়ে করবে।' (দ্রঃ তফসির/ইবনে কাথির, ৪র্থ-৭ম খণ্ড, পৃ-২৭৮)।

বইয়ের ৪০, ৪১ ও ৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, আরবরা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা এবং দর্শনের, ইতিহাস ও ভূগোলের চর্চা পরিহার করে আবার কোরানের মধ্যেই ডুব দিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। মুসলিমদের পশ্চাদগমনের এই সময়কাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আমার মনে হয়, সেই সময়কালটা দ্বাদশ শতাব্দী অপেক্ষা অধিক নির্ভুল হবে একাদশ শতাব্দী। কারণ যার হাত ধরে শুরু হয়েছিল আরবদের

পশ্চাদগামিতা ও বিপথগামিতা সেই বিখ্যাত ধর্মগুরু গাজ্জালির জীবনকালটা ছিল ১০৫৮-১১১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঐতিহাসিক ফিলিপ কে হিট্টি 'আরব জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে সে কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি চিররুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল দশম শতাব্দীর পর'। (পৃ-৪০৬)

এটা অতীব দুঃখের যে সেই পশ্চাদগমনের ধারা আজও অব্যাহত। যেটা আরও দুঃখের তা হলো, আজও এই ধারা বদলের কথা যাঁরা বলেন তাঁদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে গর্দান কাটার ফতোয়া দেওয়া হয়, এবং কাটাও হয়। ফলে সবাই চুপ। চুপ অমুসলিম সমাজের যুক্তিবাদী মানুষরাও। এই ভয় উপেক্ষা করে আমার বইটি প্রকাশ করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন প্রথমে অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ, তারপর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দেবজ্যোতি রায় মহাশয় এবং অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

১৬. ০৪. ২০১৩ — গিয়াসুদ্দিন

মানবতাবাদী শিক্ষক গিয়াসুদ্দিন

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মি. গিয়াসুদ্দিনের অনেক লেখা আমি পড়েছি। জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েও হাতে গোনা যে ক'জন মুসলিম যুবক-যুবতী-প্রৌঢ় ধর্মকারার প্রাচীর ভেঙে ধর্মান্ধতামুক্ত সমাজ গড়তে চান, মি. গিয়াসুদ্দিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ওপার বাংলায় প্রগতিশীল সুশীল সমাজের মধ্যে অনেকে পরধর্মসহিষ্ণু বলে দাবি করেন। তবে তাদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে গিয়াসুদ্দিন সাহেবের চিন্তা-চেতনার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটি আমার খুব ভালো লেগেছে। বিতর্কিত লেখিকা তসলিমাকে মাথা উঁচু করে সাহসের সঙ্গে সরাসরি সমর্থন করার মতো কলমচি ওপার বাংলায় এক-আধজনের বেশি নেই। গিয়াস সাহেব এ ক্ষেত্রে অনন্য, অসাধারণ।

এপার বাংলায় আস্তিক্য বা নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন। কিন্তু ধর্মান্ধতা -মুক্ত সমাজ গঠনে আত্মবলিদানে প্রস্তুত এমন কেউ আছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু বন্ধুবর মি. গিয়াসুদ্দিন এই মানবিক কাজে আত্মবলিদানে প্রস্তুত সে কথা এই গ্রন্থটিতেও পাবেন। মানব সভ্যতার কলঙ্ক মোল্লাতন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্রই, বিশেষভাবে দুই বাংলার শান্তিকামী মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। তারা যখন তখন যাকে খুশী মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে। পৃথিবীতে এর অসংখ্য নজির আছে। ভারতীয় সভ্যতা এবং ঐতিহ্য ধ্বংস করাই এদের প্রধান কাজ। গিয়াস সাহেব এর বিপরীত মেরুর মানুষ।

বাংলাদেশের পরধর্মসহিষ্ণু এবং ধর্মান্ধতামুক্ত চিন্তা চেতনার অন্যতম প্রতীক হুমায়ুন আজাদকে খুন করা হয়েছে। সুলেখক শাহ্‌রিয়ার কবিরকে মেরে হাড় গুড়ো করে দিয়েছে। ফলে তিনি আজ বিকলাঙ্গ জীবন যাপন করছেন। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক বাসুদেব ধর দীর্ঘদিন ধরে যে সব রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন তা যারা পড়েছেন, তারা জানেন ওখানকার মোল্লারা প্রকাশ্যে বলছে, হিন্দু হত্যা ইসলাম সম্মত। তসলিমা দেশ ত্যাগ না করলে যখন তখন খুন হয়ে যেতেন। মুক্ত মনের লেখক সালাম আজাদ 'ভাঙা মঠ' লিখে ওখানে হিন্দুদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। ওখানে হিন্দুদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

'বাংলাদেশে হিন্দুদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে— মুসলমান হয়ে যাওয়া,

খুন হয়ে যাওয়া অথবা ভারতে পালিয়ে আসা।' এ সব কথা লেখার অপরাধে তাকে খুনের হুমকি দিয়েই মোল্লারা থেমে থাকেনি, আজাদ সাহেবকে হাসিনা সরকার কলকাতাস্থ উপদূতাবাসের প্রধান পদে নিয়োগ করেছিলেন, এপার বাংলার কয়েকজন তথাকথিত ছদ্মবেশি মোল্লা হাসিনাকে বাধ্য করেছে ঐ নিয়োগপত্র বাতিল করতে। এ সব দেখে ওপার বাংলার সুশীল সমাজের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং মসিজীবী খুব সাবধানে পা ফেলছেন। মোল্লাতন্ত্রের উৎস মুখে হাত দিতে ভয় পাচ্ছেন। গিয়াস সাহেব সেখানে নির্ভীক।

বিধর্মী সংহার এবং খুন-ধর্ষণ সহ যত প্রকার অপকর্ম আছে, তাতে অংশ গ্রহণ করতে মোল্লাতন্ত্রীদের এতটুকু হাত কাঁপে বলে আমাদের জানা নেই।

সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত শক্তিশালী ভারত গঠনের উদ্দেশ্যে মানবতাবাদী বক্তব্য রাখা এবং ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচারের অপরাধে (?) ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙ্গা শাখার মাননীয় অধ্যক্ষ কার্তিক মহারাজকে বারবার খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তসলিমা এবং গিয়াসুদ্দিনকে যারা খুন করতে পারবে, তাদের অপরিমিত টাকা ইনাম দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে মোল্লাতন্ত্রী ইমাম এবং মুফতিরা।

কিন্তু ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাই ঘটুক না কেন, বাংলা তথা ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের একত্রে বসবাস করতে হবে। সেই 'বসবাস করা' তখনই শান্তিপূর্ণ হবে, যখন প্রতিটি গ্রামে অন্তত ১০ জন করে গিয়াসুদ্দিনের জন্ম হবে। বিশেষভাবে এই কথাটি বলার জন্য অকাল বার্ধক্যে 'প্রায় অথর্ব' হয়েও গিয়াস সাহেবের গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণের কাজে ব্রতী হয়েছি। এ কাজে খুশী মনে অনুমতি দিয়েছেন লেখক গিয়াসুদ্দিন এবং প্রথম সংস্করণের প্রকাশক সমীরণ মজুমদার। এ ছাড়া যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার এবং সর্বশ্রী প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, অগ্রজসম অ্যাড্‌ভোকেট রত্নেশ্বর সরকার, অনুজপ্রতিম অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বন্ধুবর কমলাকান্ত বণিক এবং রামশংকর রায়।

মে ১০, ২০১৩ — শ্রীদেবজ্যোতি রায়

বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা — ফোন : ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬

প্রসঙ্গ : মুসলিম সমাজে সংস্কার

গিয়াসুদ্দিন

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন মুহাম্মদ। তিনি আল্লার প্রেরিত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (দূত) —এটা তাঁর দাবি ছিল। তিনি বলেছিলেন, এ কথা স্বয়ং আল্লা তাঁকে ওহির (প্রত্যাদেশ) মাধ্যমে জানিয়েছে। তিনি যখন প্রথম এই ওহিটি পান তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (৬৩২ খ্রীঃ) তিনি ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য ওহি প্রাপ্ত হন। এই ওহিগুলি তাঁর মৃত্যুর একুশ বছর পরে সংকলন করা হয় একটি গ্রন্থে। সেই গ্রন্থই হলো 'কোরান' যেটা মুসলিমদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং মুসলিম সমাজের মূল পরিচালিকা শক্তি। মুহাম্মদ আল্লার নিকট থেকে প্রথম ওহিটি পান ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। তাই 'ইসলাম' ধর্মের বয়স ১৪০১ বছর। মানব সমাজ সদা পরিবর্তনশীল, আর এই ১৪০০ বছর মানব সমাজের পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও ইসলামী আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এমন দাবি হাসির উদ্রেক করে। মুসলমানদের দাবি কিন্তু তাই। শুধু তাই নয়, তাদের দাবি হলো, কোরানের প্রত্যেকটি আইন ও কথা চিরসত্য ও অপরিবর্তনযোগ্য এবং সর্বকালেই কোরান সমান প্রযোজ্য ও নির্ভুল পথ প্রদর্শক থাকবে। মুসলিম সমাজ এমন বিশ্বাস ও দাবিতেই অটল ও অনড় আজ, এবং তাই বিশ্বজুড়েই আজও কোরানকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

মুহাম্মদের জন্মস্থান মক্কার মানুষ তাঁর ধর্মকে প্রথমে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেনি। তারা বরং তাঁর প্রতি অতিশয় বিরূপ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এই নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্যে এবং তাদের নিজেদের ধর্মকে ভুল ও মিথ্যা বলার জন্যে। মক্কার মানুষরা ছিল পৌত্তলিক এবং তারা অনেক দেব-দেবীর পূজা বা আরাধনা করত। তাদের দেব-দেবীদের প্রতি অপমান তাদেরকে মুহাম্মদের প্রতি ভয়ানক ক্রোধান্বিত করে তুলেছিল। তাদের এরূপ ক্রুদ্ধরূপ দেখে মুহাম্মদ ভীত হয়ে পড়েন এবং ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে একদিন গোপনে 'মদিনা' নগরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদিনা ছিল তাঁরপক্ষে অনেক নিরাপদ স্থান, কারণ সেখানে পৌত্তলিকদের বসবাস ছিল না। সেখানে যারা বাস করত তাদের মধ্যে একদল ছিল ইহুদী, একদল খ্রীষ্টান, এবং আর একদল মানুষ ছিল তাদের কী ধর্ম ছিল জানা যায়নি। ইহুদীদের মধ্যে ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। সব দিক থেকেই মদিনা ছিল মুহাম্মদের পক্ষ একটি আদর্শ জায়গা।

মদিনা গিয়ে মহাম্মদ তাঁর রূপ বদলালেন, পথও বদল করেন। তিনি বললেন, আল্লার নতুন ওহি এসেছে, আল্লা বলেছে কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে, আল্লার পথে জেহাদ (যুদ্ধ) করতে হবে এবং জেহাদ করেই আল্লার ধর্ম 'ইসলাম'কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মুহাম্মদের কতিপয় শিষ্য তৈরি হয়েছিল মক্কায়, তাঁরা তাঁর সঙ্গে মক্কায় এসে একত্রিত হয়েছিলেন এবং মদিনাতেও কতিপয় শিষ্য ছিল। শিষ্যগণ প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি জেহাদের কথা। তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মুহাম্মদ অবশ্য তাঁদের দ্বিধা দূর করতে ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হন। তারপর দ্রুত জেহাদের জন্যে তিনি সব রকমের প্রস্তুতি গড়ে তোলেন। তিনি প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরেশদের বিরুদ্ধে যাদের ভয়ে মক্কা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। মক্কার মানুষরা কোরেশ বংশজাত ছিল বলে তাদের কোরেশ-বলা হতো। মুহাম্মদ একদিকে জেহাদ বা যুদ্ধ করেছিলেন কোরেশদের বিরুদ্ধে, আর একদিকে ইহুদীদের বিরুদ্ধেও। মুহাম্মদ যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সম্পত্তি বণ্টন করে দিতেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে। তার ফলে তাঁর শিষ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল অতি দ্রুত গতিতে। মদিনায় পলায়নের মাত্র আট বছর পরই ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দশহাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন যা মোকাবিলা করার ক্ষমতা কোরেশদের ছিল না। তারা তাঁর (মুহাম্মদ) কাছে আত্মসমর্পণ করে ও ইসলামকে কবুল করে মুসলমান হয়ে যায়। এই মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ একদিকে মক্কা ও মদিনার বুকে 'ইসলাম'কে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, এবং অপরদিকে তিনি একটি রাষ্ট্রও (ইসলামী রাষ্ট্র) স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর পূর্বে আরবে রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না।

মক্কা জয় করেই মুহাম্মদ থেমে যাননি। তিনি বললেন, আল্লার হুকুম এসেছে সমগ্র বিশ্বেই ইসলামকে কায়েম করতে হবে। আল্লার হুকুম হলো, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লা, তাই আল্লার ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মকে পৃথিবী থেকে দূর করতে হবে। মুহাম্মদ অতি দ্রুত এই হুকুম কার্যকর করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সম্রাটদের আল্লার ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন, আর তা না হলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকার হুঁশিয়ারি দিলেন। মক্কা বিজয়ের পর এভাবে তিনি বিশ্ব বিজয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর আহ্বানে কেউ কেউ সাড়া দিলেন, যাঁরা সাড়া দিলেন না তাঁদের রাজ্য আক্রমণ করা হলো। এই পথ বেয়েই ইসলামী রাষ্ট্রটি এক সময় একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হলো।

ইসলাম ধর্ম, তাই মনে রাখা আবশ্যক যে, অন্য পাঁচটি ধর্ম (religion) থেকে ভিন্ন ধর্মের। অন্য সব ধর্মের মতো কেবল ইহকাল ও পরকালের আধ্যাত্মিক ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দিকও, যা রাজনৈতিক ইসলাম নামে অভিহিত। রাজনৈতিক ইসলামের মূল কথা হলো—এক, আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ কর, জেহাদ কর এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কর। দুই, অন্য রাজ্যে ইসলামের দাওয়াত (আহ্বান) পাঠাও, কবুল না করলে আক্রমণ কর এবং পদানত করে ইসলামী শাসন ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা কর। এই হলো রাজনৈতিক ইসলাম যার লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বে আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

মাত্র আট বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের সাফল্য মুহাম্মদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর আত্মবিশ্বাসকেও। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাস থেকে একের পর এক রাজ্য আক্রমণে তিনি সৈন্যদল পাঠাতে শুরু করেছিলেন। সাফল্যও পেয়েছিলেন। তবুও তিনি স্বপ্ন পূরণে বেশীদূর যেতে পারেননি, কারণ অকাল মৃত্যু এসে তাঁর বিশ্বজয়ের পথে ছেদ টেনে দিয়েছিল। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৬২ বছর

বয়সে এবং মক্কা বিজয়ের মাত্র দুবছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসলিমরা ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেছে এবং একের পর এক যুদ্ধাভিযানের সাফল্যে মনোবল তখন তাদের তুঙ্গে। তাই তাঁর (মুহাম্মদ) মৃত্যুর পরও তাঁর অনুবর্তী খলিফারা (ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসকগণ) সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন। তাঁরাও প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একটার পর একটা রাজ্য দখল করে ইসলামী সাম্রাজ্যের অকল্পনীয় বিস্তার ঘটান। প্রায় অর্ধেক বিশ্ব চলে আসে ইসলামের পতাকা তলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমগ্র বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন তাঁদের অধরা থেকে যায়। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং বহু বিজিত দেশ ও জাতি একে একে ইসলামী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলে। অবশ্য স্বাধীন এই দেশগুলি সবাই ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল এমনটা নয়। তবে এটা সত্য যে ইসলামের বিশ্বজয়ের আকাশ-কুসুম স্বপ্নটি আরব সাগরে বিলীন হয়ে যায়।

ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক ও প্রায় অবিশ্বাস্য বিস্তার লাভ সম্ভব হয়েছিল সে যুগের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির জন্যে, মুসলমানদের যেমন বিশ্বাস, অর্থাৎ সমস্ত জয় ও সাফল্যের পশ্চাতে আল্লার সাহায্য ছিল, সেজন্যে মোটেই নয়। তখন ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগ। পররাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস করাই ছিল সে যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে রাজা বা সম্রাটের যত বেশী সৈন্যশক্তি ও যুদ্ধ নিপুণতা ছিল তিনি তত বেশী রাজ্য জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হতেন। এভাবেই একদিকে গড়ে উঠেছিল রোম সাম্রাজ্য। প্রাক-ইসলামী যুগে এই যে সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়া, বিস্তার ও সংকোচন - এটাই ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। তারমধ্যে ঈশ্বর বা আল্লার সাহায্য বা অভিপ্রায় অনুসন্ধান করা অর্থহীন। সামন্তযুগের অবসান ঘটেছে বহুকাল পূর্বে। এখন ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগে ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপন করা তো দূরস্থান, নতুন করে কোনো দেশে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলাও অসম্ভব। জনগণই তা মেনে নেবে না। কিন্তু মুস্কিল হলো, মুসলিম সমাজ ইতিহাসের এই নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেজন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম অধ্যুষিত দেশে দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রস্থাপন গড়তে ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মুসলিম সমাজের একাংশ আজও লিপ্ত ও প্রমত্ত। শুধু আপন আপন দেশেই নয়, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তারা পরিচালনা করছে সমগ্র বিশ্বজুড়েই। তার জন্য তৈরি করা হয়েছে বেশ কয়েকটি জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যার মধ্যে আল-কায়দা, তালিবান, জৈশ-এ-মুহাম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা, হরকত-ইল-জেহাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সংগঠনগুলি বিশ্বত্রাস হয়ে উঠেছে। ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী শক্তি হিসাবে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের নামও উচ্চারিত হচ্ছে। এই ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বলা বাহুল্য যে, রাজনৈতিক ইসলাম থেকে উদ্ভুত এবং একথাও বলা বাহুল্য যে, রাজনৈতিক ইসলামের উদ্ভব মূল ইসলাম থেকেই।

ইসলামী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিশ্বব্যাপী এক প্রকার বিশেষ প্রচারাভিযান সংগঠিত হচ্ছে। তা হল, ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর প্রচার। ইসলামের সঙ্গে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, এই সন্ত্রাসবাদ কিছু উগ্র ধর্মীয়

নেতার মস্তিষ্ক-প্রসূত ও তাঁদের দ্বারা পরিচালিত। তাঁদের এই কর্মকাণ্ড ইসলামের শান্তি ও সুনাম নষ্ট করছে। ইসলামী সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এরূপ প্রচারে মানুষ বিভ্রান্ত এবং এরূপ প্রচার মুসলিম সমাজকে ইসলাম ও কোরান সম্পর্কে আরও মোহাচ্ছন্ন করে তুলছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হলো ইসলামী সন্ত্রাস তথা মুসলিম জঙ্গি কার্যকলাপ বা সশস্ত্র জেহাদের নির্দেশ রয়েছে কোরানেই। নির্দেশ রয়েছে যেমন, তেমনই উৎসাহ ও প্ররোচনাও রয়েছে। জেহাদ প্রসঙ্গে কোরান কী বলেছে তা শোনা যাক্। "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" (৬৬:৯)। "যতদিন না আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, যুদ্ধ কর।" (২:১৯৩)। "আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর। তাহার পথে যুদ্ধ কর।" (৫:৩৫)। এরূপ আরও অনেক আয়াত (ওহি) আছে। একই আদেশ রয়েছে হাদিসেও। জেহাদে অংশ নেওয়ার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছে কোরান। যেমন, "আল্লাহর পথে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করিবে। ...তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, জান্নাতে ঢুকাইবেন।" (৬১:১১, ১২)। কোরান ও হাদিসের এই কথাগুলি মুসলিম জঙ্গিদের প্রেরণা জোগায় এবং অমুসলিমদের, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের বিরুদ্ধে থাকা মুসলমানদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং উদ্বুদ্ধ করে তাদের আত্মবলিদানেও।

মাদ্রাসায় (কওমি মাদ্রাসা বা খারিজি মাদ্রাসা) কোরান ও হাসিদ পাঠদান করা হয়। স্বভাবতঃই এসব মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত লক্ষ লক্ষ মুসলিম ছাত্রবৃন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে জেহাদের পাঠ নিচ্ছে। এসব মাদ্রাসার মধ্যে বহু মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে জেহাদের জন্যে মুজাহিদ (জেহাদী) তৈরি করার জন্যে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই মাদ্রাসাগুলি মুজাহিদ (জঙ্গি) তৈরি করে চলেছে অবিরাম। ফলে মুজাহিদদের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম জনমানসে মুজাহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধও ক্রমবর্ধমান।

মুসলিম সমাজের সংস্কারের জন্যে এই দিকটি উপেক্ষা বা আড়াল না করে এর উন্মোচন ও নিন্দা করা আবশ্যক। এই দিকটা যত আড়াল করা হবে কোরান-হাদিস সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে মোহ তত দৃঢ় হবে যা সমাজ সংস্কারের কাজকে অধিকতর কণ্টকিত করে তুলবে। তাছাড়া, ইসলামী সন্ত্রাসবাদের দায় সম্পূর্ণরূপে কিছু ধর্মীয় নেতাদের ওপর আরোপ করা, এবং ইসলামকে সে দায় থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করা ভয়ঙ্কর মিথ্যাচারও বটে। মিথ্যাচার দিয়ে সমাজ সংস্কার করা এবং আধুনিক ও উন্নত সমাজ নির্মাণ করা আর মহাশূন্যে মহাসৌধ নির্মাণ করা সমার্থক।

হাদিস, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে, হলো মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজ পরিচালনায় এর গুরুত্ব কোরানের সমতুল্য। মুহাম্মদের আদেশ, উপদেশ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন-যাপন এবং ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশিকা রয়েছে হাদিসে। মুহাম্মদ কিন্তু তাঁর সাহাবীদের (সহযোদ্ধা) হাদিস সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এর প্রয়োজন হবে না, কারণ পার্থিব জগতের সকল সমস্যার সমাধান এবং ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে আবশ্যক সকল পথ নির্দেশ ও নীতিমালা কোরানে রয়েছে। তাঁর অনুবর্তী প্রথম দিকের খলিফাগণ তাই তাঁর মৃত্যুর পর 'কোরান'

সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেও 'হাদিস' সংকলনের কথা তাঁরা তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় স্থান দেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বছর পর তৃতীয় খলিফা ওসমান গণির খেলাফতকালে 'কোরান' সংকলন করা হয়েছিল। এদিকে ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যার জন্ম দিতে শুরু করল। যে সব নতুন নতুন ভূখণ্ড এবং জাতি-উপজাতি সম্প্রদায় ইসলামি সাম্রাজের অধীনে এসেছে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন, সমস্যা ও চাহিদা ভিন্ন, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানেও ভিন্ন। একদিকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে বৃহৎ সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং অপরদিকে সময়ের পরিবর্তনের হাত ধরে ঘটতে থাকা সমাজের মধ্যেকার নানারূপ পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের সামনে এমন বহু সমস্যার উদ্ভব হলো যার সমাধান কোরান থেকে পাওয়া গেল না। এরূপ পরিস্থিতি খলিফাদের মুহাম্মদের জাগতিক কর্মকাণ্ডের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে বাধ্য করল। কোরানের বাইরে গিয়ে মুহাম্মদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবিলা করার চিন্তা তাঁদের করতেই হল। রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্যে তাই হাদিস অপরিহার্য হয়ে উঠল। খলিফারা বাধ্য হলেন হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে ধর্মীয় নেতাদের আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করতে। কোরানের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হলো, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্যে কোরানের পাশে হাদিস তার স্থান করে নিল, যদিও হাদিস সংকলন করতে মুহাম্মদের নিষেধ ছিল। মুহাম্মদ বলেছিলেন যে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্যে কোরান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ, এটা আল্লার রচিত এবং এর মধ্যেই জাগতিক সব সমস্যা ও প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। কিন্তু হাদিসের উৎপত্তির পশ্চাদভূমি থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কোরান একটি অসম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র এবং এর সীমাবদ্ধতার অন্ত নেই। শুধু অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাই নয়, এর (কোরান) মধ্যে যেসব নির্দেশ ও নীতিমালা রয়েছে তার অনেক কিছুই যে অপ্রাসঙ্গিক তা অচিরেই মুহাম্মদের অনুবর্তী খলিফাগণ উপলব্ধি করেন এবং সেগুলি বর্জনও করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

মানব সমাজ সদা ক্রিয়াশীল ও পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সমাজে আইন-কানুন ও রীতি-নীতির পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এরূপ পরিবর্তনের ফলে ইসলামি রাষ্ট্র এমন বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকল যার সমাধান কোরানে তো নেই-ই, হাদিসেও নেই। তাই কোরান ও হাদিস থেকে নির্মিত ইসলামি আইনের পরিবর্ধনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠল। সময়ের দাবি মেনে তাই ইসলামি আইনকে পুনঃপুন পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কোরান ও হাদিস বহির্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধান কী হবে, কী কী আইন প্রণয়ন করা কিংবা কী কী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আবশ্যক তা যুগে যুগে নির্ণয় করার দায়িত্ব অর্পিত হয় ধর্মীয় নেতা তথা মৌলানা ও মুফতি সমাজের ওপর। অবশ্য খলিফাদের শাসনকালে ধর্মীয় নেতাদের প্রণয়ন করা আইন-কানুন পরামর্শরূপে যেত খলিফার নিকট। ইসলামি আইন তথা রাষ্ট্রীয় আইনরূপে চূড়ান্তরূপ দেবার ক্ষমতা ছিল খলিফার হাতেই। কোরান ও হাদিস বহির্ভূত এরূপ আইন প্রণয়নকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যে সব সমস্যার সমাধান সরাসরি

কোরান ও হাদিসে নেই, কিন্তু কোরান-হাদিসের আলোকেই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে সেগুলির ক্ষেত্রে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আইন রচনা করেন সেগুলি হলো 'ইজমা'। যে সব সমস্যার সমাধানের জন্যে কোরান ও হাদিস থেকে কোন সূত্রই মেলে না, তখন ধর্মীয় নেতাগণ তাঁদের নিজস্ব যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার দ্বারা যৌথভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এসব ক্ষেত্রে যে আইনগুলি প্রণীত হয় সেগুলি 'কিয়াস' নামে অভিহিত। তাই ইসলামি আইনের উৎস শুধু কোরান ও হাদিস নয়, এই আইনের উৎস দুই থেকে বেড়ে হয়েছে চার—১। কোরান, ২। হাদিস, ৩। ইজমা এবং ৪। কিয়াস। ইসলামি আইন 'শরিয়তি আইন' নামে অধিক পরিচিত। এই যে যুগে যুগে শরিয়তি আইনের ক্রম পরিবর্ধন, এটাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহন করে যে কোরান ও হাদিস বহুকাল পূর্বেই ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

'কোরান' সম্পর্কে মুসলিম সমাজের বিশ্বাস অগাধ ও অপরিসীম। তারা বিশ্বাস করে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্থিব জগতের যাবতীয় সকল প্রকার সুষ্ঠু সমাধান এবং পৃথিবীর আয়ুষ্কালের শেষদিন পর্যন্ত যত সমস্যার উদ্ভব হবে তার সবকিছুর সুষ্ঠু সমাধানও কোরানে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও মুসলিম সমাজ কোরানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ ও আনুগত্য প্রদর্শন করে এই বিশ্বাস থেকে যে কোরানের প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত ও চিরন্তন কারণ এটা স্বয়ং আল্লা কর্তৃক রচিত। এই গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের কারণে কোরানের সামান্যতম সমালোচনায় মুসলিম সমাজ অস্থির, চঞ্চল, অসহিষ্ণু ও হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। কোরান সম্পর্কে এই গভীর বিশ্বাস এবং এর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তৈরি হয়েছে 'কোরান' না পড়েই এ কথা বলা বাহুল্য। কোরানের মধ্যেকার বিরাট সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পঁচানব্বই শতাংশ (৯৫%) মুসলমানই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাদিস সম্পর্কেও এই কথাগুলিই সমান প্রযোজ্য। কোরান ও হাদিসের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতাগুলি বিদ্যমান সে বিষয়ে মুসলিম সমাজ অজ্ঞ ও অনবহিত কারণ এগুলি তাদের নিকট সচেতনভাবে আড়াল করা হয়। আড়াল করেন যেমন ধর্মীয় নেতারা, তেমনি মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজও।

শুধুই কী সীমাবদ্ধতা আর অসম্পূর্ণতা? কোরানের পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল মুহাম্মদের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই। এমন প্রশ্ন ও সংশয় তৈরি হয়েছিল মুহাম্মদের সাক্ষাৎ শিষ্য তথা সাহাবীদের খেলাফতের যুগেই অর্থাৎ হাদিস সংকলনেরও বহুপূর্বে। তৃতীয় খলিফা ওসমান গণির খেলাফত কালেই (৬৪৪-৬৫৬ খ্রীঃ) তাঁর বিরুদ্ধে কোরান অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল। তিনি সে সময়ের উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের জন্যে জায়গীরদারি ও জমিদারী প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। এটা স্পষ্টতঃই কোরানের নীতির পরিপন্থী এবং স্বভাবতঃই এরজন্যে খলিফার বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। খলিফার এই পদক্ষেপের ফলে ধর্মীয় নেতারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এবং 'কোরান' নিয়ে মুসলিম সমাজে শুরু হয় তীব্র মতপার্থক্য ও মতবিরোধ। যতদিন গেছে এই মতপার্থক্য ও মতবিরোধ তত বৃদ্ধি লাভ করেছে। হাদিস নিয়ে এই দ্বন্দ্ব তো আরও তীব্র। কোরান ও হাদিস

নিয়ে মতপার্থক্য ও মতবিরোধের জন্যেই মুসলিম সমাজ বহুধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিম সমাজে অনেক দল-উপদল থাকলেও তারা মূলতঃ দুটি প্রধান দলে বিভাজিত। তা হলো— এক) সুন্নী সম্প্রদায় এবং দুই) শিয়া সম্প্রদায়। সুন্নী সম্প্রদায় ও শিয়া সম্প্রদায় আবার বহু গোষ্ঠীতে বিভাজিত। সুন্নী সম্প্রদায় ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান মতবিরোধ দুটি। একটি হলো মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত। এবং দ্বিতীয়টি হলো কোরানের সংকলন সংক্রান্ত। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর খলিফা পদ নিয়ে তুমুল দ্বন্দ্ব হয় এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রথম খলিফা হন আবু বকর। তারপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খলিফা মনোনীত হন যথাক্রমে ওমর ফারুক, ওসমান গণি এবং আলী। খলিফা পদে পরপর এই মনোনয়ন সুন্নী সম্প্রদায়ের মতে সম্পূর্ণ বৈধ ও ইসলাম সম্মত। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় মনোনয়নের এই ধারাকে সম্পূর্ণ ইসলাম ও কোরানের পরিপন্থী মনে করে। তাঁরা মনে করে মুহাম্মদের একমাত্র যোগ্য ও ইসলাম সম্মত উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁরই বংশধর ও জামাতা 'আলী'। তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং সেজন্যেই প্রথম তিনজনের খেলাফতে মনোনয়ন সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী। 'কোরান' সংকলন করেন খলিফা ওসমান গণি তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সুন্নী সম্প্রদায় এই 'কোরান' গ্রন্থটি অবিকল সংকলিত হয়েছে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের বিশ্বাস আল্লার নিকট যে মূল কোরানটি রক্ষিত আছে, ওসমান কর্ত্তৃক সংকলিত কোরানটি তারই অবিকল কপি। শিয়া সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা এই 'কোরান'কে খেলাফতি কোরান বলে মনে করে। তাঁদের মতে এই কোরান আল্লার প্রেরিত সেই কোরান নয় যেটা আল্লার হেফাজতে বেহেস্তে রক্ষিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শোনা যাক্ কয়েকটি কথা শিয়া সম্প্রদায়ের একজন ধর্মীয় নেতার মুখ থেকেই। কোরানের মধ্যে এরূপ আয়াত (ওহি) রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, আল্লা স্বয়ং কিছু আয়াত বাতিল করে সেস্থানে তার থেকেও উত্তম কিছু আয়াত প্রেরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে একজন শিয়া নেতা বলেছেন, "খেলাফত কর্ত্তৃক কোরানের কথাবিশেষকে বাতিল করিয়া দিবার সকল অপরাধ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের উপর আরোপ করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী আল্লাহ্ বাতিল করিলে আমাদের বলিবার আর কিছুই থাকিবে না, কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌র চরিত্র এবং রাসুলের চরিত্র কোথায় যাইয়া যে দাঁড়াইতেছে সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য আছে কি?

"...কোরানের বহু অংশ ফেলিয়া দেওয়ার এবং কিছু অংশ অদল-বদল করার নৈতিক অপরাধকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আল্লাহর উপরে এই মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শাসকমণ্ডলী রাসুলুল্লাহকে মধ্যবর্তী ব্যক্তি হিসাবে ভুল ভ্রান্তির অধীন করিয়া অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল অত্যধিক।" (দ্রঃ ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ, সদরউদ্দিন আহমদ চিশতি, পৃঃ-২৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোরান সংকলন করার সময় খলিফা ওসমান কোরানের কিছু অংশ জাল ও ভুল বলে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শিয়াদের মত হলো, "রাসুলল্লাহর লিখিত কোরান ছাড়াও হজরত আবু বকর একখানি কোরান লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যাহা তিনি পাঠ করিতেন। ...হাফসার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্‌র নিকট হইতে উক্ত কোরান ছিনাইয়া লইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।" (সূত্র : ঐ, পৃষ্ঠা-২২)।

হাদিস নিয়েও মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য ও মতবিরোধ। হাদিস সংকলন করা হয়েছিল কয়েকটি। ঐ সকল হাদিস পরস্পরবিরোধী অনেক হাদিসে ভর্তি ছিল। তাই কিছু হাদিসকে জাল হাদিস বলে বাতিল করে দেওয়া হয়। সুন্নী সম্প্রদায় যে সকল হাদিস গ্রন্থকে সহীহ্ (বৈধ) বলে স্বীকৃতি ও মান্যতা দিয়েছে সেগুলি হলো, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিথি শরীফ, আবু দাউদ, নিসঙ্গি প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমাদৃত ও মান্যতাপ্রাপ্ত হলো বোখারী শরীফ। এই বোখারী শরীফকেই মিথ্যা ও জাল হাদিস বলে শিয়া-মুসলমানগণ বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁদের অভিমত হলো, "কোরানে বাক্যের তফসীর উল্লেখ করিয়া বোখারী যত হাদিস প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রায় সবগুলিই মিথ্যা বচন।" (সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫১)।

শিয়া সম্প্রদায়ের গুরুতর অভিযোগ হল ইসলামী খেলাফতের তৃতীয় খলিফা ওসমান গণি তাঁর খেলাফতি ক্ষমতার (রাষ্ট্র ক্ষমতা) অপব্যবহার করে কোরানের কিছু কথা বাতিল করেন এবং তাঁর মনগড়া কিছু কথা কোরানে অন্তর্ভুক্ত করেন। শিয়ারা তাদের অভিযোগের সপক্ষে অনেক যুক্তি ও তথ্য পেশ করেছে। সেগুলি বিশদে আলোচনা করার পরিসর নেই। তাদের উত্থাপিত অভিযোগ ও বক্তব্যের মধ্যে অন্ধ আলী-প্রীতির জন্যে কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু অনেক অভিযোগই রয়েছে যেগুলি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যনির্ভর। এই ঘটনা এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোরানের কিছু বিধি-নিষেধ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেগুলির কিছু অংশ বাতিল ও কিছু অংশ সংশোধন করেছিলেন খলিফা—ওসমান গণি। একাজে নিশ্চয়ই তাঁকে তাঁর অনুগত কিছু ধর্মীয় নেতা সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

কোরানের কিছু অংশ আসল; কিছু অংশ বিকৃত এবং কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং বোখারী শরিফের হাদিসগুলি মিথ্যা ও মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বোখারীর (মৃত্যু ৮৭১ খ্রীঃ) মনগড়া রচনা, এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ সম্পর্কে সুন্নী মুসলিম সমাজের মধ্যে যারা অবহিত তাদের সংখ্যা অতি নগন্যই। সমগ্র বিশ্বে সুন্নী মুসলমানরাই ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাদের মধ্যে শিয়াদের এই ভয়ঙ্কর অভিযোগটি—বর্তমান প্রচলিত কোরানটি আল্লার প্রেরিত আসল কোরান নয়—সম্পর্কে সুন্নী সমাজের মানুষের এত অজ্ঞতা অতিশয় বিস্ময়কর। এটা সম্ভব হয়েছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো, মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম এবং শিক্ষিতদের মধ্যে কোরান-হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করার আগ্রহের অভাব। আগ্রহের অভাব এজন্যে যে দৈনন্দিন জীবনে এরূপ চর্চা ও অধ্যয়ন করা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় ও প্রধান কারণটি হলো, সুন্নী সমাজের ধর্মীয় নেতাগণ এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব নীরব থেকে খুবই চতুরতার সঙ্গে গোপন রাখতে চায়। শিয়াদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে যথাসম্ভব নীরব থাকাটা তাঁদের একটি কৌশলী সিদ্ধান্ত। এছাড়া উপায়ও তো নেই। কোরান ও হাদিসের বিরুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর অভিযোগগুলি প্রকাশ্যে এসে গেলে কোরান-হাদিসের প্রতি যে অন্ধবিশ্বাস ও আনুগত্য রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে তা কতটা অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকবে সে প্রশ্ন ও চিন্তা থেকেই শিয়াদের উত্থাপিত অভিযোগগুলি নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে ভয় পান। তাঁদের

ভয় হয়, কোরান ও হাদিসের ওপর কোনও কথা চলে না, এই দুটি গ্রন্থ মহাপবিত্র এবং সকল প্রশ্ন, সংশয় ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে, সুন্নী মুসলমানদের এই যে দৃঢ় ও নিরেট বিশ্বাস তাঁর ভিতটা যদি নড়ে যায়। আর সে রকম হলে, ধর্মীয় নেতাদের ইসলামের নামে ধর্ম-ব্যবসা ও কারবার কুসমাস্তীর্ণ ও মসৃণ পথটি তো কণ্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর হয়ে উঠবে। তাই এসব গুরুতর অভিযোগগুলি চেপে চুপে গোপন না রেখে উপায় নেই। ধর্মীয় নেতারা নৈতিক মূল্যবোধের বড়ো গলা করেন, অথচ এসব ঘটনাবলী চাপা দিয়ে আড়াল করে রেখে তার ওপর অসত্য মিথ্যার সৌধ নির্মাণ করে চলেছেন। হায়রে নৈতিকতা।

বহু প্রশ্নের উত্তরে কোরান নিরুত্তর তাই হাদিসের আবির্ভাব, আবার বহু প্রশ্নে হাদিসও নিরুত্তর তাই উত্তর দেবার ভার নিতে হলো ধর্মীয় নেতাদের—কোরান ও হাদিসের এমন দৈন্যতার কথা কজন মুসলমান জানে? এটা হলো একটি দিক। আর একটি দিক হলো, কোরানের কিছু কথা অপ্রাসঙ্গিক এবং রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। অতএব সেগুলো পরিবর্তন করো ও সেখানে কিছু নতুন কথা ঢুকিয়ে দাও, এভাবে প্রয়োজনীয় রদ-বদল করে কোরানকে সময়োপযোগী করে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মুহাম্মদের মৃত্যুর মাত্র ২১ বছরের মধ্যেই (ওসমানের খেলাফত কালে। অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে)। মুসলিম সমাজের কজন মানুষ এসব জানেন? এসব কথা জানাজানি হলে একদিকে মুসলিমদের অন্ধ বিশ্বাসের ভিতটা নিশ্চয়ভাবেই নড়ে যাবে যেমন সত্য, তেমনই অন্যদিকে যারা ভয়ঙ্করভাবে ধর্মান্ধ ও কোরানের অন্ধানুগত্যশীল তারা এসব কথা বলা বা লেখার জন্যে মুরতাদ ঘোষণা করে শিরচ্ছেদ করতে সশস্ত্রে ধেয়ে আসবে। সেই ধর্মান্ধ ও গোঁড়া সুন্নী মুসলিমদের উদ্দেশে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থেই 'একটু' মাত্র, যাকে বলে একেবারে সিন্ধুতে বিন্দু দর্শন কিংবা অতি বিরাটাকার হিমশৈলর চূড়ামাত্র। ইসলামী সাম্রাজ্য পরিচালনা এবং আরবদের ও ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য জাতি-উপজাতির মানুষের উন্নতি সাধন ও কল্যাণের জন্যে খলিফাদের কোরান-হাদিস নির্ভর শরিয়তী আইন থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এবং এমন অনেক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়েছিল যা কোরান-হাদিস ও শরিয়তের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, কোরানের অনেক নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা নির্মমভাবে তাদের বর্জন করতে হয়েছিল। এসব কথা তথাকথিত ইসলাম-বিদ্বেষীদের কল্পনাপ্রসূত নয়, ইসলামী সাম্রাজ্য এবং আরবের ইতিহাসে এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। সেই ইতিহাসের পানে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক্।

ইসলাম ধর্মে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো ঠাঁই নেই তা বলা বাহুল্য। কোনও ধর্মেই (religion) অবশ্য নেই। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা সে কথা গোপন করেন না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের মনোভাব অতিশয় বিরূপ ও বৈরী মনোভাবাপন্ন। যাঁরা বলেন সকল ধর্মের প্রতি এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলাম উদার হতে ও মৈত্রীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা প্রদান করেছে তাঁরা মিথ্যাচার করেন। এ প্রসঙ্গে কোরান কী বলেছে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করলে প্রকৃত সত্য কোনটা তা নির্ণয় করা সহজ হয়। সে কথাগুলি হলো, "অমুসলিমরা কোরানের কথায় অবিশ্বাসী এবং জাহান্নামের জ্বালানী।" (২১:৯৮)। "ওদেরকে আগুনে

পুড়াইবো।" (৪:৫৬)। 'ওদেরকে' বলতে বোঝানো হয়েছে অমুসলিমদের এবং এই উক্তির বক্তা 'আল্লা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোরানের সব কথাই আল্লার এই দাবী মুহাম্মদের। "ওরাই (অবিশ্বাসীরা) জালেম (অত্যাচারী) (২:২৫৪)। "কাফেরগণ তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।" (৪:১০১)। 'তোমাদের' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে মুসলমানদের এবং 'কাফের' হলো সমস্ত অমুসলিমরা। "কাফেররা ভোগে মত্ত, জন্তুর মত খায়।" (৪৭:১২)। "কাফেরগণ আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট জীব।" (৮:৫৫)। "অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না, ওরা তোমাদের অনিষ্ট করবে, প্রকাশ্যে ওরা তোমাদের যত শত্রু তার থেকেও ভয়াবহ শত্রুতা লুকানো থাকে ওদের মনের মধ্যে।" (৩:১১৮)। এইরূপ মণি-মুক্তা আরও আছে। শুধু কোরানে নয়, আছে হাদিসেও। অমুসলিমদের প্রতি ইসলাম কত সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরী মনোভাব পোষণ করে তা কোরানের এই আয়াতগুলি (উক্তি) থেকেই স্পষ্ট। ইসলামি রাষ্ট্রে কোনও অমুসলমান বসবাস করুক ইসলাম তা চায় না। মৃত্যুর পূর্বে মুহাম্মদ তাঁর সাহাবীদের যে ওছিয়ত (আদেশ) করে গেছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট। সেই ওছিয়তে অমুসলিমদের আরব থেকে বিতাড়নের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সাহাবীদের উদ্দেশে। ওছিয়তি এরূপ : "পৌত্তলিকদের আরব থেকে তাড়াও।" (মুসলিম হাদিস, হাদিস নং-৮০১৮)। এই কাজটি তিনি নিজেই করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি তা সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। তিনি অন্যদের তাড়াতে চেয়েছিলেন সে কথার প্রমাণ রয়েছে হাদিসে। হাদিস বলছে, "একমাত্র মুসলমান ছাড়া ইহুদী, খ্রীষ্টান সবাইকে আমি আরব ছাড়া করব।" (মুসলিম হাদিস, হাদিস নং-৪৩৬৬) মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাগণ, এবং এমনকি ধর্মান্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ মুহাম্মদের এরূপ ভয়ঙ্কর স্বৈরতান্ত্রিক ও অমানবিক কাজ ও নির্দেশকে পবিত্র জ্ঞানে স্মরণ করেন এবং নির্দ্বিধায় সমর্থন করেন। এরূপ স্মরণ ও সমর্থন প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করতেও তাঁরা সঙ্কোচ ও কুণ্ঠাহীন। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদকেও আমরা দেখেছি মুহাম্মদের সেই নির্দেশকে সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর পুস্তকে স্মরণ করতে। তিনি লিখেছেন, "এই দিন তিনি আরও তিনটি ওছিয়ত করিয়াছিলেন : (ক) কোনও মোশরেক যেন আরবে থাকিতে না পারে। ...।" (দ্রঃ মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, পৃঃ-১৬)। এখানে 'মোশরেক' কথার অর্থ অমুসলমান।

ইসলামের এরূপ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী নীতি এবং বিধর্মীদের প্রতি এরূপ চরম ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, বৈরিতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য পরিচালনার অনুপযুক্ত একথা সর্ব প্রথম অনুধাবন করেছিলেন প্রখর বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন, বিচক্ষণ ও সুদক্ষক প্রশাসক পঞ্চম খলিফা—মুয়াবিয়া। তিনিই প্রথম ইসলামী উক্ত একবগ্গা নীতি ও মুহাম্মদের নির্দেশ বর্জন করার দুঃসাহস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রায় ধর্মনিরপেক্ষতার কাছাকাছি একটি রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম সৈন্যবাহিনীতে অমুসলিম তথা কাফেরদের নিযুক্ত করেছিলেন যা স্পষ্টতই ইসলাম ও কোরানের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনিই প্রথম মোশরেক ও কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সদ্ব্যবহার করার উদারতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করার নজির গড়েছিলেন। শুধু সৈন্যদলেই নয়, রাজদরবারেও

গুরুত্বপূর্ণ পদে অবিশ্বাসীদের নিয়োগ করেছিলেন। একজন খ্রীষ্টান চিকিৎসক ইবন আসালকে তিনি তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। শুধু বিধর্মীদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস, সম্মান ও দায়িত্বই প্রদান করেন নি, তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাব ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে তিনি বহু গীর্জা মেরামত করেছিলেন। খলিফা মুয়াবিয়ার এইসব কাজগুলি আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে। কারণ—তিনিও ছিলেন একজন সাহাবা অর্থাৎ মুহাম্মদের সাক্ষাৎ শিষ্য ও সহযোদ্ধা। মুহাম্মদ তাঁকে তাঁর সচিব পদে নিয়োগ করেছিলেন এবং 'কোরান' সংরক্ষণের গুরু দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। সেই তিনিই মুহাম্মদের মৃত্যুর মাত্র ত্রিশ বছর পর প্রশাসক (খলিফা) হিসাবে এমন সব পদক্ষেপ ও নীতি নিয়েছিলেন যা ছিল স্পষ্টতই শরিয়ত বিরোধী। তিনি কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ছিলেন ভীষণ ধার্মিক এবং মুহাম্মদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেই তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশগুলি রাষ্ট্রের পক্ষে অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করলে তা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। মক্কা-মদিনা নিয়ে গড়া একটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিধর্মীদের বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করা সম্ভব, কিন্তু বৃহৎ সাম্রাজ্যে একই নীতি অনুসরণ করলে যে বিদ্রোহের আগুন তৈরি হবে তার হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই তিনি একদিকে সুবিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি বৃদ্ধির জন্যে, অপরদিকে প্রশাসনের উৎকর্ষতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন সরকারী পদে নিয়োগ প্রদানের সময় জাত-ধর্মের বিচার করার সংকীর্ণতা পরিহার করেন, এবং নিয়োগ করেছিলেন সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিদের। প্রশাসনের উচ্চপদগুলিতে উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণীদেরই নিয়োগ করার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। মুসলমানদের পালন ও অমুসলমানদের দমন নীতির পরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন' নীতি। এই সব নীতির জন্যেই তিনি একদিকে আলীর খেলাফত কালে গৃহযুদ্ধে প্রায় ভেঙে পড়া ইসলামী সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে তাকে সংহত করেন এবং তারপর তার আরও ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটান। ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ও উন্নতি সাধনের সাথে সাথে তিনি একটি সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাপরায়ণ শাসন ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিলেন। সেজন্যেই ঐতিহাসিকদের বিচারে মুয়াবিয়াই আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। অবশ্য ধর্মান্ধ মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে তিনি যা প্রশংসা লাভ করেছেন, তার চেয়ে পেয়েছেন অধিক নিন্দাই।

ইসলাম ধর্মে সাহিত্য ও কাব্য চর্চা নিন্দনীয় কাজ। গান-বাজনা ও শিল্প-কলা তো আরও নিন্দনীয়। যে কোনও প্রাণীর ছবি আঁকবে তার স্থান জাহান্নামে। মুয়াবিয়া ইসলামের এসব নীতি ও নিষেধাজ্ঞাকে মানব সভ্যতার বিকাশের পথে অন্তরায় ভেবে বর্জন করেছিলেন। তিনি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। গান-বাজনা ও শিল্প-কলা সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং মুয়াবিয়ার ভূমিকা কী ছিল সে বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাক্। এই বিষয়ে আল্লা ও মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাসী কোনও মুসলিম ঐতিহাসিকের পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করাই অধিক সমীচীন হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. ওসমান গণি এ প্রসঙ্গে

লিখেছেন, "নিরাকার আল্লাহর দূত মহানবী প্রাণীজগৎকে নিজ হাতে আকারে এনে ও এঁকে তাদের প্রতিষ্ঠা করা কোনদিনই পছন্দ করেন নি। এর মূলে ছিল তাঁর কঠোর 'ওযাহদানিয়াত', বা একেশ্বরবাদ নীতি। কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমূর্তি কোনদিনই যাতে এক আল্লাহর স্থানাভিষিক্ত না হয়ে পড়ে এই দিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি ও নিপুণ সতর্কতা। এখানে আল্লাহর দূত ছিলেন আপোষহীন অনন্য মানুষ। সঙ্গীত সম্পর্কেও মহানবীর সতর্কবাণী ছিল যেন মানব চরিত্র কলুষিত না হয়। ...কিন্তু উমাইয়া যুগে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। কোথাও বন্যপশুর ছবি, কোথাও ব্যাঘ্রের হরিণ আক্রমণ, কোথাও হিংস্র বন্য পশুর লড়াই, কোথাও তাদের যৌন মিলনের নগ্নরূপ ইত্যাদি। ...কোথাও নর্তকী, কোথাও গায়িকা, কোথাও বিচারালয়ের নিস্তব্ধ দৃশ্য।...

"...যদিও মুসলিম ধর্মান্ধ ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ গান-বাজনাকে ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন, তবুও উমাইয়া যুগে এদের প্রচলন ছিল ব্যাপক, উন্নতি ও উৎকর্ষ ছিল অসাধারণ। গান-বাজনার উন্নতি সাধনের জন্য গায়ক বা গায়িকা ও বাদক বা বাদকীর জন্য উচ্চহারে বেতন নির্ধারিত থাকত, খলিফাগণ উন্নত গায়ক ও বাদকদের দেশের দূর প্রান্ত হতে আনয়ন করে রাজসভাকে অলঙ্কৃত করতেন।" (দ্র: উমাইয়া খেলাফত, পৃ:-২১৫, ২১৬)। মক্কার অধিবাসীদের বলা হতো কোরেশ। কোরেশ ছিল একটি বংশের নাম। কোরেশ-দের মধ্যে দুটো গোত্র ছিল, তার মধ্যে একটা হলো 'উমাইয়া'। উমাইয়া বংশের কয়েকজন ব্যক্তি খলিফাপদ অলংকৃত করেছিলেন। তাদের শাসন কালকে আরবের ইতিহাসে 'উমাইয়া যুগ' বলা হয়। এ যুগের স্থায়িত্ব কাল ছিল ৯০ বছর (৬৬১-৭৫০)। এই যুগকেই ইসলামের বৃহৎ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগের স্থপতি ছিলেন মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রী:)।

ইসলামের মূল নীতিতে, শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই নির্মম সত্যি যে, আধুনিক শিক্ষার স্থান নেই। কারণ এই শিক্ষার অবস্থান ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিপরীতে। ইসলামের মূলকথা হলো প্রকৃতিজগৎ, সৌরজগৎ, প্রাণীজগৎ ও মানবজগৎ সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত, অকাট্য ও সত্য। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক শিক্ষার আলোকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কোরানের বর্ণনাগুলি সবই ভ্রান্ত ও কল্পনাপ্রসূত। সেজন্যেই ইসলাম আধুনিক শিক্ষা অনুমোদন করে না। কিন্তু এটাই তো বাস্তব সত্যি যে রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব সমাজের উন্নতির জন্যে আধুনিক শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। মুয়াবিয়া একথা অনুধাবন করতে ভুল ও বিলম্ব করেন নি। তাই তিনি তাঁর শাসনকালে মুহাম্মদ নির্দেশিত ও প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি প্রণয়ন করেছিলেন একটি নতুন পাঠক্রম যার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল বিজ্ঞান সহ আধুনিক শিক্ষায়। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ছিল ৯ টি বিষয়। যথা : ১) আরবী ব্যকরণ, ২) কোরান, হাদিস ও ফেকা শাস্ত্র, ৩) ইতিহাস, ৪) সাহিত্য ও ভাষা, ৫) বাগ্মিতা, ৬) দর্শন, ৭) বিজ্ঞান, ৮) চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং ৯) রসায়ন শাস্ত্র। মুয়াবিয়া শুধু বহু দেশকে জয়ই করেন নি, সে সব দেশ থেকে আহরণ করেন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা-ও সংস্কৃতিও। সেই আহরিত সম্পদগুলি দিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় খলিফাগণ আরবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতার যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিলেন তার গোড়াপত্তন করেছিলেন উমাইয়া খলিফাগণ, যাঁদের স্থপতি ছিলেন এই মুয়াবিয়াই। ইসলামী সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কট্টরপন্থা পরিহার করে মুয়াবিয়া যে উদার এক নতুন রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন তা সন্দেহাতীতভাবে ছিল ইসলামের পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার এটা যে একটা মস্ত বড়ো সংস্কার ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। মুয়াবিয়ার এবং উমাইয়া যুগের এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্বাস বংশের খলিফাগণ। তারফলে সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল আরবরা। তাঁদের সেই যুগটা ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ইসলামের স্বর্ণযুগ নামে খ্যাত।

'ইসলামের স্বর্ণযুগ'—এ কথা আসলে ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বিকৃতি। কারণ আব্বাসীয় খলিফাগণ আরব সভ্যতার যে আকাশ-চুম্বী উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তার পশ্চাতে ইসলামের কোনো অবদান নেই। তাঁরা এটা সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ইসলামী নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা পরিহার করেই। তাঁরা জোর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের গবেষণার ওপর এবং সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন মানুষের স্বাধীন জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধার ওপর। এগুলিই হলো সে যুগের চরম উন্নতির চাবিকাঠি। সেজন্যেই সে যুগের অবিশ্বাস্য উন্নতির কৃতিত্বের দাবীদার 'ইসলাম' হতে পারে না।, এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ সে যুগের খলিফাদের। সুতরাং 'ইসলামের স্বর্ণযুগ' নয়, ইতিহাসের সেই যুগ কেবল 'আরবের স্বর্ণযুগ' বা 'আব্বাসীয় স্বর্ণযুগ' নামে অভিহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে যুগেই ইসলামী গোঁড়ামি ও ভাবধারার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল। রাষ্ট্র মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধিকে এবং জ্ঞান ও মেধাকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। সে সময় 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'কে বাতিল করা হয় এবং তার পরিবর্তে 'মুত্তাজিলা' নীতি গ্রহণ করা হয়। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলামে'র মুলকথা ছিল কোরান ও হাদিসের ওপর কোনো কথা চলবে না। 'মুত্তাজিলা' মতবাদ ঘোষণা করলো, "মানুষের যুক্তিভিত্তিক চিন্তার ফসলগুলি কোরানের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।"

কিন্তু বিশ্ব মানব সভ্যতার পক্ষে খুবই দুঃখজনক ঘটনা হলো সেই স্বর্ণোজ্জ্বল রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা খুব বেশীদিন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ইসলামী গোঁড়ামির নিকট সেই মুত্তাজিলা নীতি অল্প কিছু কাল পরেই পরাস্ত হয়। কট্টর ধর্মীয় গুরু ইমাম গাজ্জালির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামি সাম্রাজ্য পুনরায় সেই কোরান ও হাদিসেই আত্মসমর্পণ করে। রাজ দরবার থেকে বিতাড়িত হলেন সমস্ত অমুসলিম জ্ঞান-তাপস ও বিদ্বান ব্যক্তিরা, এবং তাঁদের স্থানে ফিরিয়ে আনা হলো ধর্মান্ধ ইসলামী পণ্ডিতদের। শিক্ষার সেই পুরানো ইসলামী সংজ্ঞা ফিরে এলে ইমাম গাজ্জালির কথায়, রাষ্ট্র ঘোষণা করলো—'শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয়, ইসলামের নৈতিকার বিকাশ সাধনই শিক্ষার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য।' রাষ্ট্রের চোখে পুনরায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল পুস্তকগুলি হয়ে উঠলো অপবিত্র, আর পবিত্র ও পাঠ্য-পুস্তকের স্থানে পুনরায় ফিরে এল কোরান, হাদিস ও ইসলামী পণ্ডিতদের লেখা পুস্তকগুলি। এভাবেই ইসলামী সাম্রাজ্য পুনরায় আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকারের পথে পশ্চাদযাত্রা শুরু করল।

সামনের দিক থেকে পশ্চাৎদিকে, বৈজ্ঞানিক সভ্যতার আলো থেকে ইসলামী ধর্মান্ধতার অন্ধকারের দিকে ইসলামী সাম্রাজ্য ও আরবদের সেই পশ্চাৎযাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। সেই পশ্চাৎযাত্রা সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজে কমবেশী আজও অব্যাহত রয়েছে। সেই যে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের করাল গ্রাসে পড়েছিল বিশ্বমুসলিম সমাজ, একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উৎকর্ষতা-সমন্বিত আধুনিক মানব সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার যুগেও বিশ্বের মুসলিমরা সেই অভিশাপ থেকে আজও মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ১৪০০ বছরের পুরানো জরাজীর্ণ, অচল ও অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রগতি ও সভ্যতা বিরোধী শরিয়তী আইন ও সংস্কৃতির দমবন্ধ করা পরিবেশে মুসলিম সমাজ হাঁপানি রুগীর মতো হাঁসফাস করছে এবং অন্যান্য দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর মানুষরা যখন ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করে এগিয়ে চলেছে তখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

কেন দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত বিশ্ব মুসলিম সমাজ, এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও পরিবেশের উদ্ভব কেন হলো, এবং এ দুরবস্থা থেকে মুক্তির কী উপায় তা জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে মুসলিম সমাজের ইতিহাসের দিকে একটু সময় ধরেই আলোকপাত করতে হলো, যদিও এ আলোচনা যথেষ্ট সংক্ষিপ্তই। যে কোরানকে আল্লার রচিত গ্রন্থ এবং বিশ্ব-মানব সভ্যতার একমাত্র প্রধান ও সঠিক চালিকা শক্তি বিবেচনা করে মুসলিমরা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ন'টা শতাব্দী জুড়ে আজও শরিয়তী আইন-কানুন ও সংস্কৃতির কানাগলিতে নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথের সন্ধানে মাথা খুঁড়ে মরছে, সেই কোরানের অন্তঃসারশূন্যতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধির মধ্যে আনবার জন্যেও মুসলিম সমাজের ইতিহাস পুনঃপুন ফিরে দেখা আবশ্যকও বটে। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরানো শরিয়তী আইনাবলী ও অনুশাসন যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং তারই ফাঁসে আটকে গিয়ে যে মুসলিম সমাজ দমবন্ধকর পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে ছটফট করছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় বিশ্বব্যাপী এই সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। এটাও বোঝা যায় যে সাধারণভাবে মুসলিমরা বেরিয়ে আসতে চায় এই দমবন্ধকর পরিবেশ থেকে, কিন্তু মোল্লাতন্ত্র বলপূর্বক তাদের বেরিয়ে আসার পথটি রুদ্ধ করে রেখেছে। মোল্লাতন্ত্র এবং সাধারণ মুসলিমদের এই দ্বন্দ্বটি প্রায়শই স্পষ্টরূপেই প্রকটিত হতে দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বে মোল্লাতন্ত্রের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অমানবিক রূপটিও অনাবৃত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি শাহবানু, ইমরানা, গুঁড়িয়া, লতিফুন্নেশা এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও খ্যাতি সম্পন্ন নারীবাদী ব্যক্তিত্ব তসলিমা নাসরিনের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোল্লাতন্ত্রের মুখ বা প্রতিনিধি হলো মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তথা আলেম সমাজ তথা উলামা এবং মোল্লাতন্ত্র হলো একটি মতবাদ বা তত্ত্ব যা মানব সমাজে বিশুদ্ধ শরিয়তী সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করে এবং তা স্থাপনের জন্যে জেহাদ করা জরুরী ও মুসলিমদের আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করে।

শাহবানুর ঘটনা ঘটেছে বিগত শতাব্দীর আশির দশকে। তাঁর পতি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ ও পেশায় আইনজীবী। ওঁদের দাম্পত্য জীবনের বয়স যখন বছর তেতাল্লিশ

ও শাহবানু যখন পাঁচ সন্তানের জননী তখন শাহবানুকে তাঁর পতি গৃহ থেকে বের করে দেন। শাহবানু পিতৃগৃহে পুরো তিন বছর অপেক্ষা করেছিলেন এই আশায় যে তাঁর পতি তাঁকে ফিরিয়ে নেবেন। কিন্তু তিন বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা তাঁর ফলবতী না হওয়ায় তিনি আদালতে গিয়ে খোরপোষের মোকদ্দমা করেন। সেই মোকদ্দমাটি অকার্যকর করতে আদালতের নোটিশ প্রাপ্ত হবার পর শাহবানুর পতি শাহবানুকে তালাক দেন। তালাক দেন চিঠির মাধ্যমে। তালাকের এই পদ্ধতি বলা বাহুল্য যে ইসলাম সম্মত। আদালত অবশ্য এই তালাককে গুরুত্ব আরোপ করেনি এবং শাহবানুর পক্ষে খোরপোষ দেবার জন্য রায় প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী তথা শরিয়তী আইনের সেই দিকটা স্মরণযোগ্য যে, একজন মুসলিম নারীর বয়স যাই হোক্, সে যতগুলি সন্তানেরই জননী হোক্, কিংবা তার দাম্পত্যজীবন যতই দীর্ঘ হোক্, কোনও নিরাপত্তা নেই তাঁর পতির সংসারে বা তাঁদের দাম্পত্য জীবনে। একটা মহীরুহের একটা ডাল থেকে একটা জীবন্ত পাতা অতি অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দেবার মতো অতি সহজেই একজন মুসলিম নারীকে তার পতিদেবতা (!) তাঁদের মহীরুহ তুল্য দীর্ঘ সংসার জীবন থেকে টুক করে তুলে (পাতা ছিঁড়ে ফেলার মত) সংসারের বাইরে নিক্ষেপ করে দিতে পারে। এই হলো শরিয়তী তালাক আইনের অপার মহিমা (!) যেখানে 'পতি' নামধারী পুরুষটি সর্বশক্তিমান এবং 'পত্নী' নামধারী নারীটি শক্তি-সহায়হীন এক অবলা প্রাণী বৈ তো কিছু নয়। আর তাইতো শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা হয়ে তার প্রতিবাদ করায় চরম মাশুল দিতে হয়েছিল অবলা প্রাণীতুল্য আর এক রমণী ইমরানা-কে। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা ফতোয়া দেন ইমরানার তালাক হয়ে গিয়েছে শ্বশুরের সঙ্গে যৌন-সংসর্গের কারণে এবং ইমরানাকে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও সমস্যার সমাধান করতে বিয়ে করতে হবে তাঁর ধর্ষক শ্বশুরকেই। ইমরানা এই ফতোয়া প্রত্যাখ্যান করলে তাঁকে তাঁর (পতির) গৃহ থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং তারপর তার ওপর সামাজিক নির্যাতন চালানো হয়। গুঁড়িয়া ও লতিফুন্নেশাও শরিয়তী নির্যাতনে এমন পিষ্ট হতে হয়েছিল যে অকালে তাদের একজনের জীবন প্রদীপটাই নিভে গিয়েছিল, এবং অপরজনকে বাধ্য হয়ে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছিল।

লতিফুন্নেশাকে তাঁর পতি রাগবশত তালাক দেয়। পরে রাগ পড়লে তিনি ভুল বুঝতে পারেন এবং শ্বশুর-বাড়ী থেকে লতিফুন্নেশাকে ফিরিয়ে আনেন। এটা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা মেনে নেয়নি। কারণ শরিয়তী আইনের বিধানে এটা সিদ্ধ নয়। এই আইনের বিধান হলো, লতিফুন্নেশাকে অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে হবে এবং তার সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর লতিফুন্নেশার এই দ্বিতীয় পতি যদি তাকে তালাক প্রদান করে তবেই সে তার প্রথম পতির নিকট হালাল হবে অর্থাৎ প্রথম পতির সঙ্গে পুনরায় বিয়ের উপযুক্ত হবে, নচেৎ নয়। লতিফুন্নেশা এই বিধানকে অপমানজনক মনে করেছিলেন এবং তাঁর পতিও তাঁর সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন এবং তাঁরা শরিয়তী বিধান ও ধর্মীয় নেতাদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করেছিলেন। কিছুদিন পরে ওঁদের যমজ সন্তান হয় এবং সন্তানদ্বয় মারাও যায়। তখন সমাজের মাতব্বরগণ ঐ সন্তানদের জারজ আখ্যায় কলঙ্কিত করে এবং গোরস্থানে সমাধিস্থ করা ও তাদের সৎকারের জন্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। লতিফুন্নেশার

পতি সমাজের মাতব্বরদের কাছে গিয়ে তাদের ভুল স্বীকার করে কাতর প্রার্থনা করলেও মাতব্বরগণ সে প্রার্থনা প্রত্যাখান করেন। অবশেষে অন্য গ্রামের কবরস্থানে সমাধিস্থ করার অনুমতি মিলেছিল। এই নিদারুণ সংকটে পড়ার পর লতিফুন্নেশার পতি মনোবল ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং গ্রামের সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর পত্নীর তথা লতিফুন্নেশার অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মত হয়। লতিফুন্নেশা কিন্তু তাতে সম্মত হন নি এবং বিয়ের পূর্ব-রাত্রিতে আত্মহত্যা করে তাঁর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করেন। গুঁড়িয়াও ছিলেন লতিফুন্নেশার মতো তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী, কিন্তু লতিফুন্নেশার মতো জেদী ও প্রতিবাদী ছিলেন না। তাঁকেও জীবনের চরম মূল্য দিতে হয়েছে শরিয়তী ফতোয়া নির্দেশিত দুঃসহ জীবন যাপন করতে গিয়ে। গুঁড়িয়ার প্রথম পতি চার বছর নিখোঁজ ছিল কার্গিল যুদ্ধে গিয়ে। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় সৈনিক। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে গুঁড়িয়ার বিয়ে দেওয়া হয় আবার। এই বিয়েতে তাঁর পিতৃকূল, শ্বশুরকূল ও শরিয়তের নেতাদের সমর্থন ও সম্মতি ছিল। ইতিমধ্যেই গুঁড়িয়ার গর্ভে নতুন সন্তান এসেছে এবং তিনি তাঁর দ্বিতীয় পতিকে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাসায় জড়িয়ে নিয়েছেন গভীরভাবে। এমন সময় পাক-কারাগার থেকে তাঁর প্রথম পতি সশরীরে ফিরে এলেন যাঁকে তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে মোল্লা-মুফতিরা ফতোয়া দিল, প্রথম পতিই গুঁড়িয়ার কাছে বৈধ, দ্বিতীয় পতির সঙ্গে বিয়ে অবৈধ হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় পতির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর তালাক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গুঁড়িয়াকে প্রথম পতির কাছেই ফিরে যেতে হবে। এই ফতোয়া মানতে গুঁড়িয়ার আপত্তি ছিল তা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন স্পষ্ট করেই, এবং আপত্তি ছিল তাঁর দ্বিতীয় তথা বর্তমান পতিরও। কিন্তু মুসলিম সমাজের মাতব্বরগণ তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বলপূর্ব্বকই গুঁড়িয়াকে পতি বদল করতে বাধ্য করেছিল। ব্যক্তি গুঁড়িয়া শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে ঐ ফতোয়া মেনে নিলেও তাঁর মন ও বিবেক বিদ্রোহ করেছিল। ফলে তিনি শীঘ্রই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

না, এসব অমানবিক, নৃশংস ও মর্মান্তিক ঘটনাগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেউ ঘুমের ঘোরে তালাক বলেছে। অমনি তার পত্নীর তালাক কার্যকর করা হয়েছে। এখন ফোনে, মুঠোফোনে, ইন্টারনেটে তালাক ও বিয়ে কার্যকর হচ্ছে। এসব ঘটনা নানা রূপে, নানা ঢঙে কত যে ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। এই বীভৎস ও কুৎসিত ঘটনাগুলোর অতি সামান্য অংশই খবরে উঠে আসে, অধিকাংশই নানা কারণে খবর হয় না।

মুসলিম প্রধান দেশগুলির অবস্থা আরও বহুগুণ ভয়াবহ, করুণ ও শোচনীয়। বাংলাদেশে মুসলিম নারীরা কী ভয়ানকভাবে নির্যাতিত হয় তা আমাদের কল্পনারও অতীত। সে দেশে ভারতের চেয়েও তীব্রভাবে চলছে শরিয়তি বিচার ব্যবস্থা, সাধারণ বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সমান্তরালভাবে। কীরূপ সে ভয়াবহ ব্যবস্থা তার এক টুকরো ছবি সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সে দেশের একটি সংগঠন 'আইন ও সালিস কেন্দ্রে'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৯৯৫ থেকে এ পর্যন্ত ৫০৩ টি ফতোয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফতোয়ার পর বেত মারার ফলে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের অধিকাংশই মহিলা।' বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান

রাইটস (বি এস ই এইচ আর) বলেছে, ২০০০ থেকে ২০১০ সাল সময়ে ৩৪০ টি ফতোয়ার ঘটনা তারা পেয়েছে। ঐ সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়। কারণ ফতোয়ার শিকার অনেক পরিবারই নির্যাতিত হওয়ার পর আরো হয়রানি বা নির্যাতনের আশংকায় সাংবাদিকদের কাছে ঘটনা জানাতে চায় না। পুলিশের কাছেও যায় না। অনেকে ঘটনা প্রকাশ করে না সামাজিক লজ্জার ভয়ে। ফতোয়ার প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী। একথা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানও। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্রে যা আসে তার চাইতে ফতোয়ার সংখ্যা অনেক বেশী। যে সব ঘটনায় শাস্তি কম অর্থাৎ দোররা (চাবুক) মারার সংখ্যা কম থাকে সেগুলো সংবাদপত্রে আসে না। একেবারে সম্প্রতি ঘটা দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—ফতোয়ার শিকার এক দম্পতি এখন গ্রাম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অপরাধ, রাগের মাথায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বলেছিল। পরে স্বামী ভুল বুঝতে পারেন, আবার ঘরসংসার শুরু করেন। কিন্তু বাধ সেধেছেন ধর্মীয় মাতব্বররা, তাদের ফতোয়া, স্ত্রীকে ঘরে তুলতে হলে তাকে হিল্লা বিয়ে দিতে হবে। হিল্লা বিয়ের অর্থ হলো অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে এবং তার সঙ্গে যৌন-সঙ্গম সম্পাদন করা।

পাকিস্তানের অবস্থা বাংলাদেশ অপেক্ষাও ভয়াবহ। মুকতার মাঈ-এর ঘটনা (২০০২) তো সারা বিশ্ব জেনেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁর ভাই নাকি অন্য একটি গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল। এই অপরাধে সমাজের মাতব্বররা তাঁকে গণ-ধর্ষণের ফতোয়া দেয় এবং বলা বাহুল্য যে তা কার্যকরও করা হয়। মুকতার মাঈ তেজস্বিনী নারী। তিনি ধর্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং নিম্ন আদালত ছ'জনকে শাস্তি দেয়। কিন্তু মুকতার মাঈকে গণধর্ষণের ফতোয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও উদ্বেগজনক ঘটনা হলো, পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত ঐ ছজনের পাঁচজনকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছে। পাকিস্তানে মোল্লাতন্ত্রের দাপটে সাধারণ জনজীবন কত বিপন্ন সে তো সবার জানা, কারণ প্রতিদিনই সে বিপন্নতার ছবি সংবাদপত্রে ও দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে উঠছে। তবুও তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত একজন খ্রীষ্টান মহিলাকে (আসিয়া বিবি) ব্লাসফেমি আইনের লঙ্ঘন করায় ফাঁসীর আদেশ দেয়। এই আইনানুসারে ইসলাম ধর্ম, মুহাম্মদ এবং কোরান-হাদিসের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ ও বেআইনী। এই আইন ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আসিয়া বিবি কিন্তু আদালতকে বলেছেন তিনি জেনে-বুঝে ঐ আইন ভঙ্গ করেন নি এবং তেমন ঘটে থাকলে তারজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন। ঘটনা দুই : পাকিস্তান প্রদেশের রাজ্যপাল সলমান তাসির রাষ্ট্রপতির কাছে আসিয়ার ফাঁসী রদ করার আবেদন জানান এবং ব্লাসফেমি আইনটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই হলো তাঁর অপরাধ। তারজন্যে তাঁরই এক দেহরক্ষী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনা তিন : ঐ একই অপরাধে (?) পাকিস্তানের সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী শাহবাজ ভাট্টীকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে উগ্রপন্থী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান-এর একজন জঙ্গি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শাহবাজ ছিলেন একজন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান হলো আধা-গণতান্ত্রিক ও আধা-ইসলামিক দেশ। যে দেশগুলি নির্ভেজাল ইসলামিক দেশ অর্থাৎ যে সব মুসলিম দেশে বিশুদ্ধ শরিয়তী শাসন তথা কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সে দেশগুলির অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, আরও শোচনীয়। সে সব দেশের মানুষ কী ভয়াবহ ও দুঃসহ পরিস্থিতি ও পরিবেশে বাস করছে তা বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। এক একটা দেশ যেন এক একটা কারাগার, কারাবন্দীদের মতো সকল মানুষই সেখানে বন্দী। স্বাধীন কেবল শরিয়তের প্রবক্তারা, শরিয়তী শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের নামে কাউকে একটু বেচাল দেখলে তাঁরা তাকে যে কোনো প্রকার শাস্তি দিতে পারে, হত্যার আদেশও দিতে পারে, এমনকি হত্যা করতেও পারে। নারী ও অমুসলিমদের অবস্থা পুরুষ মুসলমানদের চেয়ে আরো অধিক শোচনীয়। যা প্রায় কল্পনারও অতীত। শরিয়তী আইন ও শাসন কত স্বৈরতান্ত্রিক, অমানবিক ও নৃশংস হতে পারে তা কিছুটা যাতে আন্দাজ করা সম্ভব হয় তারজন্য তিনটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্। দৃষ্টান্ত তিনটি তিন দেশের আদালতের রায় থেকে নেওয়া। প্রথম দেশটি আলজিরিয়া। সেখানে দুজন নির্মাণশিল্পের শ্রমিকের বিরুদ্ধে আদালতে একটি বিচার চলার ঘটনার খবর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ওঁদের একজনের নাম হোসেনি ও আর এক জনের নাম সালেম ফেল্লাক। ওঁরা উভয়েই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। ওঁদের যে অপরাধে বিচার চলছে তা হলো রমজান মাসের কোনো একদিন দুপুরে ওঁরা খাবার খেয়েছিলেন। ওঁরা সকাতর আর্জি করেন যে, আমরা তো খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, আমাদের ওপর তো রোজা রাখার কর্তব্য বর্তায় না। তাছাড়া আমরা প্রকাশ্যে ভোজন করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিনি, একটু আড়ালেই ভোজন করেছি, আমাদের মার্জনা করা হোক। ওঁদের কাতর নিবেদন পুলিশ ও বিচারক উভয়েই প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ ওদেশের সংবিধানে তথা শরিয়তী আইনে রোজার মাসে প্রকাশ্যে বা আড়ালে সকলের জন্যেই অন্নজল গ্রহণ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি আরব আমীর শাহীর। একজন পুরুষ বেধড়ক প্রহার করেছিল তার পত্নী ও কন্যাকে। প্রহারের ফলে রক্তপাত ঘটেছিল। পত্নীটি এই অন্যায়ের বিচার চেয়ে আদালতে গিয়েছিলেন। বিচার গড়িয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। সর্বোচ্চ আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড প্রদান করেছিল। কিন্তু আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায়টি নারীর পক্ষে চরম অবমাননাকর। ঐ রায় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শরিয়তের শাসনে মুসলিম নারীদের পুরুষদের সংসারে কীরূপ দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এবার শোনা যাক্ সর্বোচ্চ আদালত ঠিক কী রায় প্রদান করেছে। রায়টির মূল কথা হলো, ইসলামী আইনে পত্নী ও কন্যাকে প্রহার করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে পুরুষের। সুতরাং পত্নী বা কন্যাকে প্রহার করা অন্যায় বা বেআইনী নয়। পতি যত খুশি তার পত্নীকে, কিংবা পিতা যতখুশি তার কন্যাকে প্রহার করতে পারে, কিন্তু শরীরে যেন ক্ষত চিহ্ন না ফোটে। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিটির কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে কারণ সে প্রহার করার সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং তার প্রহারে রক্তপাত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পত্নীকে প্রহার করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পুরুষকে প্রদান করা হয়েছে শরিয়তী আইনে কোরানের নির্দেশানুসারেই। কোরানে এই নির্দেশ রয়েছে ৪:৩৪ নং আয়াতে। প্রহারের মাত্রা নিয়ে অবশ্য ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য রয়েছে। একাংশের মত হলো, পত্নী অবাধ্য

হলে নির্দয়ভাবে প্রহার করা আবশ্যক। তৃতীয় দৃষ্টান্ত ইরানের। অতি সংরক্ষণশীল ইসলামী দেশরূপে পরিচিত ইরানের সর্বোচ্চ আদালতের এই একটি রায় সারা বিশ্বকে তোলপাড় করেছে। 'আশতিয়ানি' নাম্নী এক পঞ্চাশ বৎসরের বিবাহিত নারীকে ব্যভিচারের অভিযোগে বুক পর্যন্ত পুঁতে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত, যদিও সেই নারী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অসত্য বলে জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে হিযাবে না ঢাকা তাঁর মুখমণ্ডলের ছবি প্রকাশ পাবার জন্যে তাঁকে হত্যা করার পূর্বে কারাগারে একশবার চাবুক মারার অতিরিক্ত শাস্তিও প্রদান করা হয় এবং অবিলম্বে তা কার্যকর করাও হয়। পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করার রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে আন্তর্জাতিক এই প্রবল চাপে ইরানের সরকার কিছুটা পিছু হটে এবং আশতিয়ানির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

আল্লা ও তার রসুল তথা নবীর সামান্যতম সমালোচনা বা বিরোধিতা ইসলাম অনুমোদন করে না। এরূপ কাজ শুধু নিষিদ্ধ নয়, ইসলামের চোখে মহা অপরাধও যা মোটেই মার্জনীয় নয়। যাঁরা এরূপ কাজ করেন তাঁরা আল্লা ও তার রসুলের শত্রু এবং তাঁদের হত্যা করার বিধান দেওয়া হয়েছে শরিয়তের আইনে। এই বিধানের ফলে মুসলিম সমাজের অসংখ্য যুক্তিবাদী ও প্রতিবাদী মানুষের ওপর শরিয়তী নির্যাতন নেমে এসেছে। সেই নির্যাতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, কতজন পঙ্গু হয়েছে, কতজনকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এরূপ নির্যাতিতদের নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই, তবে এক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মৌলবাদীরা কী নিষ্ঠুর আচরণ করে চলেছে এবং কী নির্দয়ভাবে তাঁকে তার স্বদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করেছে। তাঁরা তাঁকে হত্যা করতেই চেয়েছিল এবং এখনও চায়। তাঁর অপরাধ তিনি মুসলিম নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা চেয়েছেন, এবং চেয়েছেন নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাঁচতে।

সারা বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা একশকোটির ওপর, এখন প্রায় ১০০/১২০ কোটি। মুসলিমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মগোষ্ঠী। ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, এত বিশাল এক জনসমাজ, যারা একদা গোটা বিশ্বকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগীয় ও পশ্চাদপদ শরিয়তী মোহজাল ছিন্ন করে, তারা এই একবিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত নতুন এক যুগেও সেই শরিয়তী আইন ও অনুশাসনের ফাঁসেই আটকে রয়েছে। হ্যাঁ, তারা আটকই রয়েছে, এই ফাঁস থেকে বেরোতেই চায় কিন্তু পারছে না বলে প্রবল বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধা নিয়েই যে সেই ফাঁস গলায় পরে রয়েছে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় মুসলিম সমাজজীবনের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলে। একবার এক পলক দৃষ্টিপাত করা যাক মধ্যপ্রাচ্যের ও আরবলীগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রতি। মিশর, সিরিয়া, বাহারিন, ইয়েমেন, লিবিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে মানুষ বিদ্রোহ করেছে। তাদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠার দাবিতে। জনগণের বিদ্রোহ দমনে কোথাও কোথাও রাষ্ট্র নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করেছে বিদ্রোহী জনতার ওপর এবং বহু হতাহত

হয়েছে। তবুও বিদ্রোহ অব্যাহত আছে। এইসব দেশগুলিতে কোথাও ত্রিশ বছর, কোথাও চল্লিশ-বছর ধরে স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলছে। মানুষ একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের অবসান চায়, তা সামরিক বা ফৌজি একনায়কত্বই হোক কিংবা ধর্মের নামে শরিয়তী একনায়কতন্ত্রই হোক। সেজন্যেই যে মুসলিম জনতা আজ জীবন তুচ্ছ করে রাস্তায় নেমেছে তা বলা বাহুল্য। একথা আজ বিশ্বাস করার সময় হয়েছে যে, বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে উঠেছে সেই আগুনে পুড়ে ছাই হবে মুসলিম দেশগুলির সকল প্রকার স্বৈরতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন এবং তার স্থান নেবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এবার একবার দৃষ্টি ঘোরানো যাক্ মুসলিম নারীদের প্রতি। শরিয়তী আইন ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো শিকার মুসলিম নারীরাই। এই আইনে নারীরা চরম শোষিত ও বঞ্চিত এবং নির্যাতিত। প্রাক ইসলাম যুগের নারী আরবের সমাজে প্রচুর অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করতো। ইসলাম সেসব একে একে হয় খর্ব করেছে না হয় সম্পূর্ণ হরণ করেছে। আরবের স্বাধীন নারীকে ইসলাম, শুধু গৃহবন্দী করে তার পায়ে শিকলই পরায়নি, তাকে হিযাব-বন্দী করে পুরুষের হাতের একটি পুতুল করে ছেড়েছে। নারীর ওপর হিযাব আরোপ করা হয়েছে এই কথা বলে যে তার ফলে তার সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা পাবে। পুরুষের এই ছেলেভুলানো কথায় নারী কখনই বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নারীর ওপর বলপূর্বক এটা চাপানো হয়েছে। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা জয়ের পর যে ইসলামী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল সেই রাষ্ট্র যেমন মক্কার পৌত্তলিক কোরেশদের ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল, ঠিক তেমনই নারীকেও বাধ্য করা হয়েছিল হিযাব বা বোরখা পরতে। নারী যে বোরখা পরতে চায় না তা সহজেই বোঝা যায় মুসলিম নারীদের প্রতি লক্ষ্য করলে। ভারতে প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি কোটি মুসলমান যার মধ্যে বোরখা পরার উপযুক্ত নারীর সংখ্যা হবে সাড়ে তিন থেকে চার কোটি। এই বিপুল সংখ্যক নারীর কজন বোরখা পরে? মোল্লাতন্ত্রের হিংসায় ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কত শতাংশ নারী বোরখা পরে? বড়ো জোর পাঁচ থেকে দশ শতাংশ। বোরখা পরা কিন্তু ঐচ্ছিক নয়, শরিয়তে নারীর জন্যে এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তবু মুসলিম নারীরা এটা বর্জন করেছে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে। তারা বর্জন করেছে কারণ তারা বোরখা পছন্দ ও সমর্থন করে না এবং এই দেশগুলি তাদের ওপর বোরখা পরার আইন আরোপ করেনি। অপরদিকে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে মুসলিম নারীর প্রত্যেকেই বোরখা পরে। সেটা এজন্যে নয় যে বোরখার শরিয়তী আইনের প্রতি তাদের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও স্বেচ্ছা-আনুগত্য আছে এবং বোরখায় তাদের সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষা হয় বলে বিশ্বাস করে। তারা বোরখা পরে সকলে শরিয়তের নির্দেশ-পালনের জন্যে নয়, পরে রাষ্ট্রের আইনে পরতে বাধ্য বলে এবং না পরলে সাজা পেতে হবে বলে। ইসলামিক রাষ্ট্রের মুসলিম নারীরা রাষ্ট্র ও মোল্লাতন্ত্রের রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত হয়ে বোরখায় শুধু তাদের শরীরটাই নয়, প্রবল স্বাধীন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাটাও কীভাবে ঢেকে ফেলে তার একটি চাক্ষুষ প্রমাণের চমৎকার বিবরণ অঙ্কন করেছেন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন ভারতীয় মুসলমান লেখক - আকবর আহমদ। লণ্ডন থেকে দোহা পর্যন্ত একটা বিমান-ভ্রমণের সময় মুসলিম নারীদের এই মনের ভাব ও ভীতিটা তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ

করেন। সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন যে বিমানটিতে অনেক মুসলিম নারী উঠেছিলেন যাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে বোঝার উপায় ছিল না যে তাঁরা মুসলিম নারী। তাঁরা মুসলিম তা বোঝা গেল বিমানটি আরব উপদ্বীপের আকাশ-সীমার মধ্যে প্রবেশ করার প্রাক-মুহূর্তে। বিমানের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিমানের পাইলট যখন ঘোষণা দিলেন যে বিমানটি আরব উপদ্বীপের আকাশ-সীমার মধ্যে প্রবেশ করছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গন্তব্যস্থানে অবতরণ করবে, অমনি বিমানের অভ্যন্তরের পরিবেশে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। নারী যাত্রীগণ নিমেষের মধ্যে তাঁদের আসন থেকে অন্তর্হিত হয়ে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন। এবং অতি দ্রুত তাঁদের ইউরোপীয়ান পোশাক পরিত্যাগ করে মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কালো বোরখা শরীর ঢেকে নিজের নিজের আসনে ফিরে এলেন। আকবর আহ্মদ এটাকে নাটকে অভিনেত্রীদের এক ভূমিকা থেকে আর এক ভূমিকায় (role) অভিনয় করার জন্যে পোশাক বদলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লেখক আরও বলেছেন যে, কোনও নারী তার দেশের আইন বা প্রথা যদি অগ্রাহ্য করে তবে সে দেশের সমাজ তাকে কুৎসিত বা কুলটা অপবাদ তো দেবেই, এমনকি তার জন্যে তার পরিবারকে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সহ নানা বিপদ ও বিড়ম্বনায় পড়তে হবে। আকবর আহ্মদের চাক্ষুষ করা এই ঘটনার বিবরণ এবার তাঁর কলম থেকেই শোনা যাক—"...I boarded the connecting British Airways flight in London alongwith a planeload of other Western looking passengers. ...As the tiny image of our plane on the inflight screen gradually approached the Arabian Peninsula, the topography below us changed dramatically. ...Our pilot announced that we would be arrriving at our destination soon, the last transfer point before Doha.

One after another, the women on my flight suddenly began disappearing into the restrooms of the plane. They filed past in their fashionable European clothes, only to emerge covered from head to toe in black traditional robes, some with black veiles over their faces. It was like a costume change in a play in which the actors slipped effortlessly into alternate roles. One minute Western looking women were chanting confidently with their husbands, and the next they were transformed into reserved, whispering companions, sitting more self-conciously in their seats with a subtle hint of difference.

These women were preparing themselvas for the culture in their home countries. Their costume change on the flight epitomizes one of the modern world's great social dilemas : how to maintain cultural traditions in the face of the globalization. In today's world, different socities overlap, are mixed, and juxtaposed–their people forced to walk a tight-rope, from which a slight slip could be disastrous. The women on my flight would be at ease in

western clothes sitting in a cafe in Regent's Park in London but in their home country would acquiesce to the segragation and modesty demanded there. ...If these women were to challenge their local customs by revealing another "identity", they would be gossiped about and slandered by their society, which could greatly embarrass their entire family." (Journey into Islam, P-83, 84).

কী নারী, কী পুরুষ, মুসলিম সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষেরই যে শরিয়তী শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থায় দমবন্ধ হয়ে আসার উপক্রম, তাদের কাছে এই ব্যবস্থা অভিশাপ বৈ নয় এবং তারা এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু তা অর্জন করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে এই ব্যবস্থার ফাঁসে বন্দী হয়ে রয়েছে তার সপক্ষে আরও অনেক দৃষ্টান্তের বিবরণ দেওয়া যায়।

আধুনিক যুগে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ক্রমবর্ধমান। স্বভাবতঃই মানবাধিকার আন্দোলন এবং নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের সমান অধিকারের আন্দোলনও ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। নতুন নতুন অনেক দাবি এসব আন্দোলনের ফলে অর্জিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা যত বেশী সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী হচ্ছে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পক্ষের দাবিগুলি বেশী বেশী মান্যতা ও প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে ততই শরিয়তী আইন ও অনুশাসনের ফতোয়া-রাজ ও বিচার-ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল, কুৎসিত ও অমানবিক চেহারাটা নগ্ন ও উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি এবং এর আইন-কানুন ও ভাবধারার চিরন্তন সত্য ও শাশ্বত্বের দাবিটিও ক্রমশ হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ছে। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাগণের এসব নিয়ে অবশ্য কোনরূপ চিত্তবৈকল্য ঘটে না, তাঁরা থাকেন নির্বিকার। আল্লা ও আল্লার রসুলের (নবী) প্রতি যারা অবিশ্বাস ও অনানুগত্য প্রদর্শন করে, কিংবা আল্লা ও রসুলের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তার জন্যে আল্লা যে কঠোর শাস্তির বিধান প্রদান করেছে, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উচিৎ কাজ বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। মানবতা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের বিচারধারা ও যুক্তিকে তাঁরা কাফেরদের অজুহাত মনে করে। তাঁদের কাছে আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রশ্নহীন আনুগত্যের উর্ধ্বে মানবতা, উদারতা, সহনশীলতা, ক্ষমশীলতা প্রভৃতির স্থান হতে পারে না। তাই মানুষ ইসলামের কোন্ আইন ও ভাবধারা সম্পর্কে কী মূল্যায়ন করলো, কতটা বিরূপ হলো বা কী নিন্দা-মন্দ করলো সেসব কিছুই ওঁদের কাছে অতি তুচ্ছ ও উপেক্ষার যোগ্য। কোনো সমালোচনাতেই, তা যতোই কঠোর হোক, ওঁরা অস্বস্তি বা বিব্রত বোধ করেন না। কিন্তু অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করেন তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। তাঁরা গণতন্ত্র, মানবতা, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, ধর্ম নিরপেক্ষতা, বিজ্ঞান-ভাবনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে আধুনিক ভাবধারা ও চিন্তাধারার সমর্থক ও পূজারী বলে দাবি করেন, নিজেদের প্রগতিশীল বলে জাহির

করেন ও প্রগতিশীল সমাজে অবাধে বিচরণ করেন, আবার নিজেদের মুসলমান পরিচয় নিয়েও অহঙ্কার ও গৌরব করেন। ইসলামের প্রশংসা ও জয়গানের ঢাক পেটানো তাঁদের অন্যতম প্রধান কাজ এবং একাজে তাঁরা অক্লান্ত সৈনিক ও আত্ম-নিবেদিত প্রাণ। তাঁরা ভীষণ অস্বস্তি ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন আলজিরিয়া, আরব আমীরশাহী, ইরান প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রগুলির আদালতের অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ও বর্বরোচিত রায় শুনে, বাংলাদেশে ঘটতে থাকা শরিয়তী ফতোয়ায় নৃশংস বেত্রাঘাতে নারীর মৃত্যুর খবরে, ব্লাসফেমি আইনের সমালোচনার জন্যে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত খ্রীষ্টান মহিলাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলে, কিংবা মুকতার মাঈ, ইমরানা, গুঁড়িয়া, লতিফুন্নেশা প্রভৃতি মুসলিম নারীদের প্রতি কুৎসিত ও নিকৃষ্ট ফতোয়া নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলে। বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিদিন মুসলিম জঙ্গিরা যেভাবে নরমেধ যজ্ঞে প্রমত্ত রয়েছে এবং অক্লেশে ও অতি অবহেলায় আল্লার নামে ও আল্লার পথে বিধর্মীদের হত্যা করছে তার জন্যেও তাঁদের (উচ্চশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলিমদের) বিব্রত হতে দেখা যায়। তাঁরা বিব্রত হন যত না মুসলিম নারী লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হওয়ার জন্যে কিংবা ইসলামী হিংসায় মানুষের মৃত্যুর জন্যে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিব্রত হন ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বলে। সেজন্যে শরিয়তী ঐসব ফতোয়া বা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ নম নম করে সেরে ফেলে অতি তৎপরতার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ইসলামের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে। নারীর প্রতি চরম অবমাননাকর সকল ফতোয়া ও ইসলামী হিংসাকে তাঁরা অনৈশ্লামিক বলে খারিজ করে দেন। তাঁরা গাড়ী গাড়ী নিউজপ্রিন্ট খরচ করে দাবি করেন যে ঐসব ফতোয়া ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড ইসলামসম্মত নয়, ওসব ধর্মীয় নেতাদের মনগড়া ফতোয়া। তাঁরা (ধর্মীয় নেতারা) কোরানের অপব্যাখ্যা করে ওসব বিধান রচনা করেছেন যার সঙ্গে মূল ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁদের দাবি হলো ইসলাম একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম, যে ধর্ম শান্তি, প্রগতি, সম্প্রীতি, দয়া, উদারতা, মানবতা ও ক্ষমশীলতার বাণী প্রচার করেছে এবং পৃথিবী থেকে সমস্ত হিংসা, বিদ্বেষ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করার জন্যে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্যে এই ধর্মের আগমন ঘটেছে।

ইসলাম ও শরীয়ত নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। কারা বিভ্রান্তির জনক— মুসলিমদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, না মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবীগণ? ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তথা মৌলানা মুফতিদের প্রতি মুসলিম সমাজের আস্থা আজও প্রায় অটুট ও ঈর্ষণীয়। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দাবিও শিক্ষিত মুসলিম সমাজে ব্যাপক সমাদৃত। ফলে ইসলাম ধর্মের কোনটা প্রকৃত রূপ, আর কোনটা মনগড়া বা বিকৃত রূপ তা নিয়ে বিভ্রান্তি ক্রমবর্ধমান। বিভ্রান্তি কেবল মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, অমুসলিম সমাজেও এটা পরিব্যপ্ত। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রচারণা দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হয় অমুসলিম সমাজের মানুষজনও। তাদের মধ্যে এরূপ ধারণা পরিলক্ষিত হয় যে ইসলাম সত্যিই শান্তি, ক্ষমা ও মানবতার ধর্ম, একাংশের উগ্র ও কট্টর ধর্মীয় নেতা পর্যাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে কোরানের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে ইসলামকে বিপথগামী করছে এবং ইসলামকে কলুষিত করছে। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের এই পরস্পরবিরোধী দাবিই সকল প্রকার বিভ্রান্তির উৎস বা জনক। এই

বিভ্রান্তির অবসান হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর তার জন্যে সরাসরি কোরান-হাদিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই সবচেয়ে উত্তম।

ঈশ্বর কেন্দ্রিক সকল ধর্ম পুরুষতন্ত্রকে নানাভাবে আরও প্রভূত পরিমাণে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলেছে। 'ইসলাম' তার ব্যতিক্রম নয়। এরূপ দাবির কথা শোনা যায়, ইসলাম নারীর মুক্তিদাতা এবং পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নারীকে একমাত্র ইসলাম ধর্মই দিয়েছে। এরূপ দাবির কোন সত্যতা দৃষ্টিগোচর হয় না। একেবারে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন দাবি বৈ নয়। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন নারীর ওপর পুরুষকে প্রদান করেছে একচেটিয়া আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও বিপুল ক্ষমতা। এই আইন নারীর প্রতি করেছে চরম অবিচার ও অপমান। নারী এই আইনে সম্পূর্ণ অধিকারহীন ও ক্ষমতাহীন পুতুল মাত্র। মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইনে যে সব ধারা ও উপধারা রয়েছে সেগুলি সবই একপেশে, পুরুষের স্বার্থবাহী ও সম্পূর্ণরূপেই নারীবিরোধী। এই আইনের ধারাগুলি শুধু পশ্চাৎপদ অগণতান্ত্রিকই নয়, আধুনিক সমাজের পক্ষে অতিশয় লজ্জাজনকও। পুরুষের বহুবিবাহ এই যুগে ভীষণ নিন্দনীয় ও ভর্ৎসনাযোগ্য। কোরান ও হাদিস সম্পর্কে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের দাবি হলো এই শাস্ত্রগ্রন্থ দুটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং সর্বকালের জন্যে সমান উপযোগী। সেই কোরান পুরুষকে বহুবিবাহ করার এবং একই সঙ্গে চারজন পত্নী রাখার অনুমতি প্রদান করেছে। যেহেতু আধুনিক সমাজে বহুবিবাহ করা ও বহু পত্নী রাখা অতিশয় নিন্দনীয়, স্বভাবতঃই ইসলাম ধর্ম ও কোরান-হাদিসের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাশ্বত্বের দাবিটি হাস্যকর হয়ে ওঠে। তাই কোরানের এই বহুবিবাহ আইনের কদর্যতা আড়াল করার প্রয়াস দৃষ্টিগোচর হয়। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ বলেন, বহুবিবাহ ও চারজন পত্নী রাখা রাখার অনুমতি অবাধ ও শর্তহীন নয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন, পত্নীগণ চিররুগ্ন, কিংবা সন্তান-ধারণ-ক্ষমতা রহিত হলে বহু পত্নী রাখার অনুমতি আছে, নচেৎ নয়। বহু পত্নী রাখার জন্যে আরও একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো, সকলের প্রতি সমান বিচার করার সামর্থ্য থাকা চাই। পত্নীদের চিররুগ্নতা বা সন্তান ধারণের অক্ষমতার শর্তগুলির উল্লেখ কোরানে আছে কিনা সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্ন বুদ্ধিজীবীদের সমীপে নিবেদন করা যাক্। বহুবিবাহ ও এক পুরুষের চার জন পত্নী রাখার প্রাক শর্তগুলি কি সুবিবেচনা-প্রসূত? এগুলি নারীর পক্ষে অবমাননাকর নয়? পত্নীর রুগ্নতা বা সন্তান-ধারণের অক্ষমতার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তো পতির ক্ষেত্রেও ঘটা সম্ভব। সেক্ষেত্রে নারীকে সেই একই সুযোগ প্রদান করা হয় নি কেন? নিদেনপক্ষে ঐরূপ পতি থেকে মুক্ত করে নারীকে অন্য পতি গ্রহণ বা অন্য পুরুষকে বিয়ে করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কেন? বলা বাহুল্য যে, এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। থাক্ সে কথা। বরং দেখা যাক বহুবিবাহ করা ও বহুপত্নী একসঙ্গে রাখার বিষয়ে কোরান কী বলছে। কোরানের ভাষ্যটি এরূপ: "যদি ভয় হয় যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না; তবে পছন্দমত দুই, তিন বা চারিজন করিয়া স্ত্রী বিবাহ কর; যদি সুবিচারের ভয় হয়, তবে একজন অথবা অধিকারভুক্ত দাসীকে; ইহাতে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।" (৪:৩)। এই আয়াতে পত্নীর চিররুগ্নতা বা বন্ধ্যাত্বের কোনো উল্লেখ নেই। এখানে যে শর্ত রয়েছে তা হলো, যে

নারীকে বিয়ে করবে সে যদি বিধবা বা পতি-পরিত্যক্তা হয় এবং তার সঙ্গে যদি সন্তান থাকে তবে সেই অনাথ (ইয়াতিম) সন্তানদের প্রতি সুবিচার করতে হবে। বহুবিবাহ করা এবং বহুপত্নী সহকারে সংসার যাপনের জন্যে কোন শর্তই কোনও যুগেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ১৪০০ বছর পূর্বে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো এই আইনটি কিছুটা প্রগতিশীল ছিল, কিন্তু এই আইনটি যে কবেই পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এই শর্তটি নিয়ে আর একটি কথা বলা খুবই জরুরী। তা হলো, এই শর্তটি আসলে শর্তই নয়, এটা পুরুষের জন্যে একটা সাধারণ পরামর্শমাত্র যা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয়। এটা পালন করা না করার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পুরুষের বিবেক ও মর্জির ওপর। এর ফলশ্রুতি হলো, বহু মুসলমানই যারা বহুনারী ভোগ করতে চায় তারা উক্ত পরামর্শকে তাদের বিবেকে স্থান দেয় না। আবার এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, ঐ পরামর্শটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়, কারণ যারা বহুবিবাহ করে ও বহুপত্নী রাখে তারা কুমারী ও অল্পবয়সী নারীদেরই বেশী পছন্দ করে।

পুরুষের বহুবিবাহ করা ও বহুপত্নী রাখা যে অবাধ ও শর্তহীন, ইসলামী আইন ও সংস্কৃতিতে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাসে। স্বয়ং মুহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবীগণের জীবনীর মধ্যেও এর ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। মুহাম্মদ নিজে অনেকগুলি বিয়ে করেছিলেন। কতগুলি বিয়ে করেন তিনি তা নিয়ে বিতর্ক বা মতপার্থক্য রয়েছে, তবে সবাই একমত যে তিনি ন্যূনপক্ষে তেরোটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর, ওমর ফারুক, ওসমান গণি ও আলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁরা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর সকলেই খলিফাপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরাও সকলেই বহুবিবাহ করেছিলেন এবং কোরানের এই বিষয়ে পরামর্শটি হয় তাঁরা অগ্রাহ্য করেছিলেন, না হয় তাঁদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর বিয়ে করেছিলেন চারটি, দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক সাতটি, তৃতীয় খলিফা ওসমান গণি আটটি এবং চতুর্থ খলিফা আলী (মুহাম্মদের জামাতা ও খুড়তুতো ভাই) বিয়ে করেছিলেন দশটি। এই খলিফাদের বিয়ের ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক রয়েছে যা আলোচনার দাবি রাখে। প্রথম খলিফা আবু বকরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পত্নীকে বিয়ে করেন মুহাম্মদের আর একজন বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী যুবায়ের। এবং চতুর্থ পত্নীকে বিয়ে করেন চতুর্থ খলিফা আলী। মুহাম্মদের কন্যা ফতেমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবু বকর ও ওমর ফারুক, কিন্তু মুহাম্মদ বিয়ে দিয়েছিলেন আলীর সাথে। আলীর দ্বিতীয় কন্যা কুলসুমকে (অল্পবয়সী) বিয়ে করেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক। তৃতীয় খলিফা ওসমান বৃদ্ধ বয়সে (৭৪ বছরে) বিয়ে করেন খ্রীষ্টান মহিলা নায়লাকে। নায়লা অবশ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নবী এবং তাঁর সাহাবীদের এই বহুবিবাহ ও বহুপত্নী রাখার ইতিহাস দুটি সাক্ষ্য বহন করছে—এক. ইসলাম বহু বিবাহে নিরুৎসাহ করেনি, এবং কোনও শর্ত আরোপ করেনি; দুই. নবী ও তাঁর অনুবর্তী খলিফাগণ যখন যাকে পছন্দ হয়েছে তাকে অবলীলায় বিয়ে করেছেন তাঁদের অন্যান্য পত্নীদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও আপত্তিকে পদদলিত করেই। সুতরাং কোরান এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবী

খলিফাদের জীবনী থেকে স্পষ্টভাবেই এটা প্রমাণিত হয় যে ইসলামী আইনে বহুবিবাহ ও বহুপত্নী রাখার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বা আইনী শর্ত রয়েছে বলে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যে কথা প্রচার করেন তা ইসলামী বিবাহ আইনের কদর্য রূপকে আড়াল করার কপট প্রয়াস বৈ কিছু নয়।

বহু বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটির—সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে হবে—প্রতি আলোকপাত করা যাক। এই শর্তটির কথাই সবচেয়ে বেশী প্রচার করেন মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ এবং এটাকেই প্রমাণ হিসাবে উত্থাপন করে বলেন যে, ইসলাম বহুবিবাহে নিরুৎসাহ করেছে, ঢালাও অনুমতি প্রদান করেনি। বহুবিবাহ করা ও বহুপত্নী রাখার ক্ষেত্রে স্বয়ং নবী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীগণ কীরূপ ঢালাও উৎসাহ প্রদান করে গেছেন তাঁর বর্ণনা ওপরে সংক্ষেপে করা হয়েছে। এখন দেখা যাক্ শর্তটির প্রতি কোরান সত্যিই কতটা দায়বদ্ধ। 'সকল পত্নীর প্রতি সমান ও ন্যায় ব্যবহার যে করতে সক্ষম, তার জন্যে বহুবিবাহ বৈধ'—এই শর্তটির প্রতি কোরান নিজেই দায়বদ্ধ থাকে নি। দায়বদ্ধ থাকেন নি স্বয়ং নবীও। কোরানে পরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, সকল পত্নীর প্রতি সুবিচার ও ন্যায় বিচার করা সম্ভব নয়। কোরানের সেই ভাষ্যটি হলো, "যতই ইচ্ছা কর, স্ত্রীদের ব্যাপারে সমান ব্যবহার করিতে পারিবে না।" (৪:১২৯)। কোরানে পরে পুরুষকে এরূপ স্বাধীনতাও দেওয়া হয়েছে যে পত্নীদের মধ্যে যাকে খুশি অধিক ভালবেসে কাছে রাখতে পার এবং যাকে অপছন্দ তাকে দুরে সরিয়ে রাখতে পার। সেই ভাষ্যটি এরূপ : "সেই ভার্যাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর তুমি দূরে রাখিবে ও যাহাকে ইচ্ছা কর নিকটে স্থান দিবে।" (৩৩:৫১)। প্রসঙ্গত বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, স্বয়ং মুহাম্মদও তাঁর পত্নীদের প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায়বিচার করেন নি এবং তারজন্যে তাঁর স্ত্রীদের তাঁর প্রতি ব্যাপক অসন্তোষ ছিল। তিনি একসঙ্গে চারজন পত্নী রাখার ইসলাম প্রদত্ত সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণ করেন নি, তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর নয়জন পত্নী জীবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজনকে (আয়েশা, হাফ্সা, জয়নাব ও উম্মে সালমা) তাঁর কাছে রেখেছিলেন এবং পাঁচজনকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। (সূত্র : কুরআন শারীফ, গিরিশচন্দ্র সেন, পৃ:-৪৮১)। যে চারজন পত্নীকে অতি আদরে তাঁর নিকটে রেখেছিলেন তাঁদের বয়স ছিল কম, ত্রিশের নীচেই। পত্নীদের মধ্যে, এমনকি কাছে থাকা পত্নীদের মধ্যেও সমান ও সুবিচার না পাওয়ার জন্যে মুহাম্মদের প্রতি যে ব্যাপক অসন্তোষ ছিল তার প্রমাণ কোরানে রয়েছে। একদা জয়নাব ছিল মুহাম্মদের সর্বাধিক প্রাণপ্রিয়, তার জন্য আয়েশা ও হাফসা খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা দুজন প্রতিবাদী চরিত্রের নারীও ছিলেন। তাঁদের প্রতিবাদে মুহাম্মদ অতিশয় রুষ্ট হয়ে তাঁদের তালাক (ইস্তফা) দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন। এমন ঘটনা যে ঘটেছিল তার স্পষ্ট ইঙ্গিত কোরানের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই ইঙ্গিতপূর্ণ দুটি আয়াত হলো, "তোমরা দুই জনে (হে পয়গম্বরের দুই ভার্যা) যদি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আইস, (ভাল হয়) অনন্তর নিশ্চয় তোমাদের অন্তর কুটিল হইয়াছে, ...। যদি সে তোমাদিগকে বর্জন করে তবে তাহার প্রতিপালক (তোমাদিগ অপেক্ষা উত্তম মোসলমান বিশ্বাসিনী ... বিবাহিতা ও কুমারী নারীদিগকে তাহাকে বিনিময় দান করিতে সমুদ্যত।" (৬৬:৪,৫)। এই দুটি আয়াতে দুই ভার্যা বলতে ইঙ্গিত করা

হয়েছে আয়েশা ও হাফসাকে এবং 'বর্জন' কথাটার মানে 'তালাক'। যাঁরা "সকল পত্নীর সাথে সমান আচরণ ও বিচার করতে পারবে না তাদের জন্যে বহুবিবাহ বৈধ নয়"—একথা বলে ইসলামী বিবাহ্ আইনের প্রশংসা করেন, তাঁরা সচেতনভাবেই এই ঘটনাগুলি গোপন করেন যে কোরানে পরে এই শর্তটি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং স্বয়ং মুহাম্মদও তাঁর পত্নীদের সকলের প্রতি সমান ও ন্যায় ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটা সমগ্র মানব সমাজের সাথে, বিশেষত মুসলিম সমাজের সাথে একটা ভয়ঙ্কর প্রতারণা যার তুলনা মেলা ভার।

'উৎসাহ তো নয়ই, 'ইসলাম' বহু বিবাহে পুরুষকে দারুণভাবে নিরুৎসাহ প্রদর্শন করেছে', বলে যাঁরা অক্লান্তভাবে গলাবাজি করেন তাঁরা যারপরনাই বিব্রত হন মুহাম্মদের সীমাতিরিক্ত বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে। "আল্লার দূত কেন অতগুলো বিয়ে করবেন?" এই তীক্ষ্ম প্রশ্নবাণে বিদ্ধ ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা তখন ভীষণ করুণ দেখায়। তড়িঘড়ি প্রশ্নটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেন একটি ছেলে ভুলানো উত্তর দিয়ে। তাঁরা বলেন মুহাম্মদ নিজের স্বার্থে বা প্রয়োজনে বহুবিবাহ্ করেন নি, ইসলাম ধর্মের প্রসারের স্বার্থে এবং প্রয়োজনেই করেছিলেন। এই উত্তরটির মধ্যে নির্মম একটা সত্যকে চাপা দেবার করুণ প্রয়াস তো আছেই, উত্তরটি অতীব হাস্যকরও। মুহাম্মদের বিয়ে সংক্রান্ত জীবনের অধ্যায়টি নিরপেক্ষ ও যুক্তি নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তাঁর অনেকগুলি বিয়ের সঙ্গে ইসলামের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল না। মুহাম্মদের বহুবিবাহের অধ্যায়টি অনেক বিস্তৃত। এ আলোচনায় তা বিশদে তুলে ধরার অবকাশ নেই। তাই সংক্ষেপে মাত্র কিছু কথার সাহায্যে সেই নির্মম সত্যটি তুলে ধরা হলো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুহাম্মদ ঠিক কতগুলি বিয়ে করেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিহাসে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। সংখ্যাটা যে সর্বনিম্ন তেরো এবং সর্বোচ্চ বাইশ - এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। তবে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য একটি মত হলো, মুহাম্মদ ষোলটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর ষোলটি পত্নীর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁদের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলি এরূপ : আয়েশা ও হাফসা ছিলেন মুহাম্মদের দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমর ফারুকের কন্যা। দ্বিতীয় পত্নী সওদাকে মুহাম্মদ বিয়ে করেছিলেন তাঁর প্রথম পত্নী খাদিজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। জয়নাবের সঙ্গে মুহাম্মদের বিয়েটি ইতিহাসে খুবই বিতর্কিত, কারণ জয়নাব ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ। তাঁর পালিত সন্তান যায়েদ তাঁকে তালাক দিলে তিনি (মুহাম্মদ) তাঁকে বিয়ে করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী মুহাম্মদ মক্কায় হজ করতে গিয়ে তিনদিন সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই তিন দিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্যে তিনি তাঁর ফুফু (পিসি), বিধবা মাইমুনাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কার কোরেশগণ অবশ্য তাঁর সাধ পূরণ করেনি। মুহাম্মদের পত্নীদের একজন, মারিয়াকে তিনি একজন বাদশার কাছ থেকে দাসীরূপে উপহার পেয়েছিলেন। বাকী পত্নীদের মধ্যে তিনজন—রায়হানা, জরিয়া ও সফিয়া ছিলেন ইহুদী। মুহাম্মদ তাঁদেরকে গণিমাতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনটি ইহুদী গোষ্ঠীকে পরাস্ত করার পর এবং তাঁদের পতিরা সবাই মুহাম্মদের সৈন্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ঐ তিনজন বিধবা ইহুদী নারী ক্রীতদাসী হিসাবে মুহাম্মদের অধীনে আসার পর তিনি তাঁদের বিয়ে করেন। এছাড়াও অপর তিনজন

পত্নীকে মুহাম্মদ বিয়ের রাত্রেই তালাক দেন। তাঁরাও ছিলেন গণিমাতের মাল অর্থাৎ বিজিত বিধর্মী সম্প্রদায়ের যুদ্ধবন্দী নারী। সেই তিনজন নারী বিয়ের রাতে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুহাম্মদের মুখের উপর বলেছিলেন যে তাঁরা জীবন থাকতে তাঁর (মুহাম্মদ) সঙ্গে শয্যাভাগ করবেন না। মুহাম্মদ যে জন্যে তাঁদের তালাক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই তেজস্বিনী তিনজন নারীর নাম ছিল আসমা, মলেকা এবং ফতেমা বিনতে আব্‌দ্‌দহকে। বাকি তিনজন পত্নীও বিয়ের পূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মুহাম্মদের এই বিয়ে-বৃত্তান্ত প্রমাণ করে যে তাঁর বহুসংখ্যক বিয়ের ঘটনার সাথে ইসলামের সম্পর্ক ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মুহাম্মদ যাঁদের বিয়ে করেছিলেন তাঁদের সকলেই ছিলেন অতীব সুন্দরী এবং বিয়ের সময় খাদিজা ব্যতীত সকলেই ছিলেন অল্পবয়সী ও যৌবন প্রাচুর্যে ভরপুর রমণী। অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রমী ছিলেন আয়েশা, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ (ছয়) বছর যখন মুহাম্মদের বয়স ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) বছর।

ইসলামের তালাক আইনটি আরও কুৎসিত যা আরও পুরুষতান্ত্রিক এবং আরও নারীবিরোধী। এই আইনটি বেশ সুবিস্তৃত এবং এর মধ্যে অনেক ধারা-উপধারা রয়েছে যা সবিস্তারে আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই। সকল ধারা ও উপধারাগুলিই পুরুষের অনুকূলে ও নারীর প্রতিকূলে। এই আইনে সামগ্রিকভাবেই পুরুষের তালাক প্রদানের ক্ষমতা অবাধ ও অপরিসীম। কোনও পরিস্থিতিতেই, অর্থাৎ শত অত্যাচারের মধ্যে ডুবে থাকলেও নারীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা নেই। পত্নীকে মাত্র একটি ক্ষেত্রে তালাক দেবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তাও শর্তসাপেক্ষে। সেটা 'খুলা তালাক' নামে খ্যাত বা কুখ্যাত। শর্তটি হলো, নারী যদি 'খুলা তালাক' দেয়, এবং তার পতি যদি তা কবুল (স্বীকার) করে তবে তা কার্যকর হবে, কিন্তু পতি কবুল না করলে সেই তালাক কার্যকর হবে না। অর্থাৎ নারীর এই তালাক দেবার অধিকারটুকু (সুযোগ) পতির অনুমোদনসাপেক্ষ, পতি অনুমোদন করলে তালাক কার্যকর হবে, নচেৎ নয়। নারীর প্রতি কী নিষ্ঠুর পরিহাস ও প্রতারণা!

তালাক দেবার পদ্ধতি নিয়ে মুসলিম সমাজে মতভেদ আছে। একটি মত হলো, এক-তালাক দেবার পর এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন হলে দুই তালাক দেবে। এভাবে তিন তালাক দেবার পর তালাক কার্যকর হবে। এই মতটির সমর্থন কোরানে রয়েছে। অন্য মতটি হলো, এক সঙ্গে বা এক নিঃশ্বাসে তালাক প্রদান করলেও তালাক কার্যকর হবে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ এই মতটি সমর্থন করেন না, এবং এই শরিয়তী আইনটিকে তাঁরা অনৈশ্লামিক ও ধর্মীয় নেতাদের মনগড়া বলে প্রচার করেন। মুসলিম সমাজে অবশ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দাবি ও মতটি গৃহীত হয় নি। এই মতটি গৃহীত হয় নি তার কারণ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দাবিটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, অর্ধ সত্য মাত্র। তাঁরা একটা সত্য সচেতনভাবে গোপন করেন, তা হলো, হাদিসে এক সঙ্গে তিন তালাককে বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। আর এটা তো সর্বজনবিদিত যে, শরিয়ত আইনের প্রধান দুটি ভিত্তি হলো কোরান এবং হাদিস। হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়ত আইনের ৩৩৭, ৩৩৯ ও ৩৪০ নং ধারায় পরপর তিন তালাককে বৈধ তালাক বলে গণ্য করা হয়েছে। ঐ হাদিসটি ঠিক কী বলছে তা দেখা যাক্, "... পরে যখন

ওমর (রা:) এর জমানায় লোকগণ অহরহ এবং উপর্যুপরি তালাক দিতে শুরু করল, তখন ওমর (রা:) তিন তালাকে যথার্থ বিধান তাদের জন্য বাস্তবায়িত করলেন।" (মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-৩৫৪০)। ইসলাম ও শরিয়ত বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামের সেবক হিসাবে মুহাম্মদের পর সমগ্র মুসলিম জনতার কাছে ওমরই হলেন সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তার দেওয়া বিধান বাদ দিয়ে শরিয়ত আইন রচনার প্রশ্ন ওঠেই না। তাই 'পরপর তিন তালাক বললে 'তালাক' ইসলাম-সম্মত হয় না'—মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এই দাবি শুধু অর্ধসত্যই নয়, প্রকৃত বিচারে এটা মিথ্যাচারও বটে।

না, তালাক দেবার জন্যে পত্নীর কোনও অন্যায় থাকতে হবে এমন কোনও শর্ত নেই। কোরান বলছে, পুরুষ যদি অন্য কাউকে পত্নী করে আনতে ইচ্ছা করে, তবে সে তার পূর্বের পত্নীকে কোনও কারণ বা অজুহাত ব্যতীতই তালাক দিতে সক্ষম। হ্যাঁ, একেবারে ঠিক তাই, কোরান পুরুষকে এরূপ অপরিসীম ক্ষমতা প্রদান করেছে। কোরান বলছে, "যদি এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, এবং তাহাদের কাহাকেও বহু মাল দিয়া থাক, তবে উহা হইতে কিছু নিও না।" (৪:২০)। কোরানে পুরুষকে তালাক দেবার এই অবাধ ক্ষমতা প্রদানের জন্যেই মুসলিম নারীদের কোন নিরাপত্তা নেই। সেজন্যে শাহবানু ও লতিফুন্নেশার মতো প্রতিনিয়ত কতশত মুসলিম নারীর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে তার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কোরানের এই ভয়ঙ্কর আইনের সুযোগ নিয়েছিলেন মুহাম্মদের বড়ো নাতি ইমাম হাসান। তিনি একশ'টি বিয়ে করেছিলেন, এবং একদিনে চারজন পত্নীকে তালাক দিয়ে ঐ দিনেই তিনি চারজনকে বিয়েও করেছিলেন।

তালাক আইনে পত্নীকে তালাক দেবার পদ্ধতি কত সহজ তা তো বোঝা গেল। শুধু কী তাই? পতি যদি মনে করে তার পত্নীকে তালাক দেবে এবং তার সে অভিপ্রায় প্রকাশ্যে ব্যক্ত না করে কেবল মনে মনে পোষণ করে পত্নীর সঙ্গে চার মাস সহবাস না করে তবে পত্নীর তালাক হয়ে যাবে, তিন তালাক বলার প্রয়োজন হবে না। এই তালাককে শরিয়তের পরিভাষায় 'ইলা' তালাক বলে। কোরানের ২/২২৬ নং আয়াতে এই বিধিটি রয়েছে। আয়াতের ভাষ্যটি হলো : "যাহারা স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাহাদের চারিমাস অবকাশ আছে। অতঃপর যদি বিলিয়া (শপথ ত্যাগ করে), তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"

ইমরানার উপর তালাকের ফতোয়ায় গোটা দেশ চমকে উঠেছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলেছিলেন, ঐ ফতোয়াটি ইসলামসম্মত নয়। ওঁদের কথাই সাধারণভাবে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল মোল্লা-মুফতিগণ কোরান ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু না, ফতোয়াটি যতই অবিশ্বাস্য ও কুৎসিত মনে হোক্, ওটা শরিয়তসম্মতই। শরিয়ত আইনের ২৮৫(খ) নং ধারা অনুসারে ঐ ফতোয়াটি একবারে নির্ভুল। ঐ ধারায় বলা হয়েছে, "কোন নারী কোন পুরুষের সাথে যেনা (ব্যভিচার) করিলে তাহার জন্য নিম্নোক্ত পুরুষগণের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ (হারাম)—(১) ব্যভিচারীর পিতা, পিতার পিতা ও তদুর্ধ্বগণ; (২) ব্যভিচারীর পুত্র, পুত্রের পুত্র ও তদনিম্নগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইমরানা যেমন অভিযোগ করেছিলেন যে তাঁকে তাঁর শ্বশুর

ধর্ষণ করেছে, তেমনই ইমরানার বিরুদ্ধেও ব্যাভিচারের (যেনা) অভিযোগ আনা হয়েছিল। ধর্মীয় নেতাগণ ইমরানার বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগের ভিত্তিতেই ঐ ফতোয়া প্রদান করেছিলেন যা নিঃসংশয়ে শরিয়তসম্মত বা ইসলামসম্মত।

লতিফুন্নেশা এবং তাঁর দুই (মৃত) যমজ সন্তান যে ভয়ঙ্কর ফতোয়ার শিকার হয়েছিলেন তা কোরান ও হাদিস - এই দুটি ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে। কোরানে ২/২৩০ নম্বর আয়াতের নির্দেশ হলো : "যদি সে তাহাকে তালাক দেয়, অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাহার হালাল নহে, পরে যদি তালাক দেয় এবং উভয়ে আল্লাহর সীমা রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া ধারণা হয় তবে প্রত্যাবর্তনে কোন পাপ নাই।" এই নির্দেশে বা বিধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে আর একটি বিধান সেটার উন্মোচন করা একান্তই আবশ্যক। তা হলো অন্য স্বামীর সঙ্গে শুধু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই হবে না, তাকে শরীরটাও সম্পূর্ণ সঁপে দিতে হবে যাতে সে যৌন-সম্ভোগে পরিপূর্ণ তৃপ্ত হতে পারে। না, এটাও ধর্মীয় নেতাদের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, এই বিধান স্পষ্ট করে যান স্বয়ং মুহাম্মদ। বোখারী শরীফের ২১৭৪ নং হাদিসে এই বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গুঁড়িয়াকে যে ফতোয়ায় তাঁর অমতে ও আপত্তি সত্ত্বেও দ্বিতীয় পতির নিকট থেকে প্রথম পতির হাতে বলপূর্ব্বকই তুলে দেওয়া হয়েছিল সেটাও শরিয়ত আইন অনুসারেই। পতি কতদিন নিরুদ্দেশ থাকলে তার সঙ্গে তার পত্নীর বন্ধন ছিন্ন হবে বা তালাক হবে তা নিয়ে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে শরিয়ত আইনের তারতম্য দেখা যায়। সুন্নী মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হানাফী মতাবলম্বী। এ প্রসঙ্গে তাঁদের মত হলো নিরুদ্দেশ পতির জন্যে চার বছরের অধিক সময় অপেক্ষা করতে হবে। অন্যমতে চার বছর পর্যন্ত। এই বিধান অনুসারে গুঁড়িয়ার যেহেতু প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ (তালাক) হয়নি তাই তাঁকে সেই প্রথম স্বামীর শয্যায় জোর করেই তুলে দেওয়া হয়েছিল।

তালাক আইনে পুরুষের তালাক প্রদানের এই অসীম ক্ষমতা থাকার জন্যে সে চাইলে শত শত নারীকে বিয়ে করতে পারে। এই বিবাহ ও তালাক আইনের জন্যে মুসলিম সমাজে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকটা গ্রামে অনুসন্ধান করলে ৮/১০ জন তালাক প্রাপ্তা ও পতি-পরিত্যক্তা মুসলিম নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তালাক প্রাপ্তা ও পতি-পরিত্যক্তা মুসলিম নারীদের স্বার্থে কাজ করছেন এমন একজন সমাজকর্মী খাদিজাবানু সম্প্রতি বললেন যে, তাঁদের সমীক্ষা অনুসারে এরূপ মুসলিম নারীর সংখ্যা মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় এক লক্ষ। এসব নারীদের গড়ে ২/৩ টি নাবালক সন্তান সহ হয় তালাক দেওয়া হয়েছে অথবা পরিত্যাগ করা হয়েছে। শরিয়ত আইনে তথা ইসলামী আইনে এই অসহায় নারীদের সহায়তা দেবার বিধান নেই। পতি-পরিত্যক্তা নারী খোর-পোষের দাবি করে আদালতে গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে তালাকের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ইসলামী আইনে তালাক প্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে পতিকে মুক্ত রাখা হয়েছে। তার ফলে এই অসহায় নারীরা নাবালক ছেলেমেয়েসহ মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই যখন তাদের সংখ্যাটা এক লক্ষ,

তখন সমগ্র রাজ্যে, কিংবা সারা দেশে, কিংবা বিশ্বজুড়ে তার সংখ্যা কত হতে পারে ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। সেজন্যে নারী পাচারকারীদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মুসলিম সমাজ এবং সারাদেশে প্রধানত এই কারণেই নারী পাচারের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান রয়েছে সকলের শীর্ষে।

বিয়ে ও তালাক আইনের মধ্যে 'ইদ্দত' নামে আর একটি আইন আছে। এটাও নারীর প্রতি বৈষম্য ও অবিচারের আর একটি নগ্ন দৃষ্টান্ত। এই আইনে তালাকপ্রাপ্তা নারী পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে তাকে কমপক্ষে তিন ঋতুকাল (প্রায় তিন মাস) অপেক্ষা করতে হবে। তখন সে যদি গর্ভবতী থাকে তবে অপেক্ষমান কাল গর্ভ-খালাস পর্যন্ত। (দ্রঃ কোরান-৬৫:১)। তালাকদাতা পুরুষের জন্যে 'ইদ্দত' নেই, অর্থাৎ তার কোন 'অপেক্ষা-কাল' নেই। সে একই সঙ্গে তালাক দিতে পারে, আবার বিয়ে করতেও পারে। কারো যদি চারটি পত্নী থাকে, এবং সে যদি অন্য একটি মেয়েকে পেতে চায় তার বাহুতে, তবে একটা পত্নীকে তালাক দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই অন্য মেয়েটিকে বিয়ে করতে সে সক্ষম।

নারীর জন্যেই কেন 'ইদ্দত'? মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা এই আইনের জন্যে নিজেদের গর্বিত মনে করে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও। ঐ প্রশ্নের উত্তরে কোরান বলছে, তালাক প্রাপ্তা নারীর গর্ভে তার তালাক দাতা পতির ঔরসজাত কোন সন্তান আছে কিনা তা দেখা কর্তব্য এবং সেজন্যে নারীর 'ইদ্দত' পালন করা জরুরী। এ যুগে এটা জানার জন্যে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে কেন, ত্রিশ মিনিটেই তো জানা সম্ভব? হ্যাঁ, জানা সম্ভব, তবুও নারীকে তিন ঋতু অপেক্ষা করতে হবে, কারণ আল্লার বিধান সংশোধন করা বা পাল্টানোর অধিকার নেই। এ প্রসঙ্গে কোরান বলছে, "আমার সুস্পষ্ট আয়াত পঠিত হইলে, যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তাহারা বলে — 'অন্য কুরআন লও বা ইহা বদলাও', বলুন, নিজে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি।" (১০:১৫)। কোন গর্ভবতী তালাক প্রাপ্তা নারীকে যদি কেউ জেনে-বুঝে বিয়ে করতে চায় তবে ইদ্দত পালন করতে হবে কেন? এ প্রশ্নেরও সদুত্তর নেই কোরান-হাদিসে। কোরান বলছে, গর্ভবতী নারীর তালাক হয় না। গর্ভবতী নারী সেই তালাক স্বীকার করলেও তালাক কার্যকর হয় না। এই আইনে তাই নারীর প্রতি শুধু অবিচার নয়, অপমানও করা হয়েছে।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন নিয়ে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের খুব গর্ব। গর্ব এজন্যে, যেহেতু একমাত্র ইসলামেই নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদে অধিকার প্রদান করেছে। তাঁদের দাবি, নারীকে তার ন্যায্য অধিকার দিয়েছে আল্লা। কিন্তু বৃথা এ গর্ব এ যুগে। এ যুগের তুলনায় এই আইনটি নিকৃষ্ট আইনে পরিণত হয়েছে। শরিয়ত আইনে এটা ফারাজ আইন নামে পরিচিত। এই ফারাজ আইন নারীকে তার ন্যায্য অধিকার মোটেই দেয়নি, বরং প্রতি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ব্যাপক বৈষম্য করেছে এবং নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই আইনের কয়েকটি ধারা এরূপ ঃ "মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকলে ও কেবল পিতা-মাতাই উত্তরাধিকার হলে মা পাবে ১/৩ অংশ, পিতা পাবে ২/৩ অংশ।" "নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে তার পতি পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। নিঃসন্তান পুরুষ মারা গেলে তার

স্ত্রীগণ পাবে এক চতুর্থাংশ। (কোরান-৪:১২)। "মৃত স্ত্রীর সন্তান থাকলে তার পতি পাবে এক-চতুর্থাংশ, মৃত পতির সন্তান থাকলে তার স্ত্রী বা স্ত্রীরা পাবে এক-অষ্টমাংশ।" (সূত্র : ঐ) অন্য একটি ধারা বলছে, "মৃতের কন্যা ও পুত্র সন্তান থাকলে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে।" (কোরান—৪:১১)। উপরে বর্ণিত প্রতিটি ধারায় তথা প্রতিটি ধাপে পুরুষ পাবে নারীর দ্বিগুণ অংশ। সুতরাং নারীকে ইসলাম ধর্ম উত্তরাধিকার আইনে ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে এমন দাবি সত্যের অপলাপ মাত্র। ফারাজ আইনে আরও দুটি ধারা আছে যা আরও অমানবিক এবং সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত। ইসলাম দত্তক আইনে দত্তক সন্তানকে তার পালক পিতা-মাতার সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার প্রদান করা হয়নি। মজনু বিলাস নামে আর একটি আইন আছে যে আইনে, মৃত ব্যক্তির পিতা বেঁচে থাকলে সেই পিতার যাবতীয় সম্পত্তির এক কানাকড়িও পাবে না মৃতের বিধবা পত্নী ও অনাথ সন্তানেরা। উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেই বিধবা-পত্নী ও তার নাবালক সন্তানগণ এবং দত্তক সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে সে প্রশ্নের উত্তর নেই কোরান-হাদিসে।

'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' নিয়ে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাদের ও ধর্মান্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি যে শুধু বিস্ময়কর তাই নয়, হাস্যকরও বটে। এই আইনের অন্তর্গত একটি ধারাও কালোত্তীর্ণ নয় তা বলা বাহুল্য। সেজন্যে এই আইনটি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশে এখন আর সমাদৃত হয় না। অনেক মুসলিম দেশ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং তালাক আইনের ব্যাপক সংস্কার করেছে। তালাক দেবার অধিকার নারীকেও দেওয়া হয়েছে এবং আদালতের বাইরে তালাক প্রদানকে বেআইনী ও অবৈধ করা হয়েছে। তুরস্ক, তিউনিসিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, ইরাক প্রভৃতি দেশে এই সংস্কার হয়েছে। অবশ্য সর্বত্রই আমূল সংস্কার বা সমান সংস্কার হয়নি। ইরানের মতো অতি রক্ষণশীল দেশেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছে। অনেক মুসলিম দেশ যেখানে 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন'কে হয় বর্জন করেছে না হয় তার ব্যাপক সংস্কার করেছে সেখানে আমাদের মহান ধর্মনিরপেক্ষ (!) ও বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক (!) দেশটি এই আইনটির মায়া আজও কাটাতে পারেনি। এ দেশে এই আইনটির কোন সংস্কার হয়নি। তার মানে এই নয় যে এ দেশের মানুষের কাছে এই আইনটি খুবই সমাদৃত হয়েছে বা সমাদর লাভ করেছে। এ দেশের মুসলিমদের আল্লা, আল্লার নবী ও কোরানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্য যে রয়েছে তা সংশয়াতীত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের প্রতি মুসলিমদের প্রশ্নহীন আনুগত্য আজও অটুট রয়েছে এমন ধারণা ভ্রান্ত। এই আইনের পশ্চাৎপদতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষময় কুফল ও জ্বালা প্রতিনিয়ত মুসলিম সমাজকে বিপর্যস্ত করছে। ফলে এর বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। সেই অসন্তোষ ও ক্ষোভ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশও করে। তাই তো শাহবানু, ইমরানা, গুঁড়িয়া আর লতিফুন্নেশারা সংবাদের শিরোনামে উঠে আসে। এরা একজন-দুজন নয়, একশ-দু'শোও নয়, হাজারে হাজারে এই নির্যাতিত মুসলিম নারীরা ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিম সমাজে। এটা কোন কষ্ট-কল্পনা নয়, কিংবা কোন আনুমানিক ধারণা নয়। এটা যে অতি বাস্তব সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই তো সেদিন কলকাতার রাজপথে। দিনটা

ছিল ৯ই ডিসেম্বর '২০১০। 'বেঙ্গল ফোরাম ফর মুসলিম উইমেন'স রাইট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট'-এর পতাকার নীচে জড়ো হয়েছিল প্রায় একহাজার মুসলিম নারী যারা তালাকপ্রাপ্তা অথবা পতি-পরিত্যক্তা। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে তাদের দাবী ছিল—(ক) বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে হবে, (খ) মুসলিম নারীদেরও তালাক প্রদানের অধিকার দিতে হবে এবং তালাক কার্যকর বা তালাকের নিষ্পত্তি করতে হবে আদালতে, (গ) উত্তরাধিকার আইনে নারী ও পুরুষের সম-অধিকার দিতে হবে। (ঘ) মুসলিমদের জন্যেও দত্তক আইন কার্যকর করতে হবে আদালতে, (ঙ) তালাকপ্রাপ্তা ও পতি-পরিত্যক্তা মুসলিম নারীদের সরকারী সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের প্রতি যদি মুসলিম নারীদের এত অসন্তোষ ও ক্ষোভ থেকে থাকে এবং তারা যদি এই আইনের অবসান চায় তবে এই আইনটি এখনও মুসলিম সমাজে চালু রয়েছে কেন এবং কীভাবে? এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত তিনটি কারণে। মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা খুবই সংগঠিত এবং তাঁদের পশ্চাতে রয়েছে রাষ্ট্র, ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী মানুষ। আর তৃতীয় কারণটি হলো যারা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট এবং এর অবসান চায় তারা সংখ্যায় যদিও ব্যাপক তবুও কার্যত নীরব থাকে। কারণ তারা অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয় নেতাগণ প্রধানতঃ রাষ্ট্রশক্তির মদতেই মুসলিম ব্যক্তিগত আইন তথা শরিয়ত আইনকে মুসলিম সমাজের ওপর চাপিয়ে রাখতে পেরেছে। ইমরানা, গুঁড়িয়া, লতিফুন্নেশা ও শাহবানুরা জীবনকে বাজি রেখে ফতোয়া এবং ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলি ফতোয়া ও ফতোয়াবাজদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে ফতোয়াবাজ মোল্লাতন্ত্রের ধারক-বাহক মোল্লা-মুফতিগণ ঐ প্রতিবাদী নারীদের ওপর তাদের ফতোয়া কার্যকর করে অনায়াসে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েও পার পেয়ে গেছে এবং ঐ নির্যাতিতা নারীদের জীবনদীপ অকালে নিভে গেছে। এমন ঘটনা প্রতিদিনই কত ঘটে যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই তো কী নারী, পুরুষ, মুসলিম সমাজের অসংখ্য মানুষ যারা শরিয়ত আইন, বিশেষ করে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অবসান চায় তারা মোল্লাতন্ত্রের নির্যাতনের ভয়ে মুখ খুলতে পারে না।

শরিয়তী, ফৌজদারী আইনগুলি আরও নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ। গণতান্ত্রিক ও সভ্য সমাজে এই আইনগুলি শুধু অনুপযুক্তই নয়, ভীষণভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনার যোগ্য। কোরানের প্রতি, হাদিসের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য সত্ত্বেও সাধারণভাবে মুসলিম দেশগুলি এই আইনগুলিকে তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেনি, এবং নির্মমভাবে সম্পূর্ণই বর্জন করেছে। সৌদি আরব, ইরানের মতো আঙুলে গোনা কয়েকটি ইসলামী রাষ্ট্রে এই অমানবিক, অসভ্য ও নৃশংস আইনগুলি আজও প্রচলিত রয়েছে। এই আইনে ব্যভিচারের একটি শাস্তি হলো ব্যভিচারী/ব্যভিচারিণীকে পাথর নিক্ষেপ করে নির্দয়ভাবে ও নৃশংসভাবে হত্যা করার বিধান। এই আইনটি নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কারণ হাদিসে এর স্পষ্ট প্রমাণ থাকলেও কোরানে নেই। শরিয়তী আইন কোরান এবং হাদিস-এই দুটি প্রধান উৎস থেকেই নির্মিত তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং ব্যভিচারের শরিয়তী আইন ও তার শাস্তির

বিধানটি সম্পূর্ণরূপে ইসলামসম্মতই। শিয়া সম্প্রদায় এই শাস্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করে না এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অভিমতও সেরূপ। পাথর নিক্ষেপ করে ব্যভিচারীকে হত্যা করার বিধানটিতেও উৎকট লিঙ্গ-বৈষম্য বিদ্যমান। শরিয়তী আইনের ১২৯ নং ধারায় এই বিধানটি রয়েছে। এখানেই শরিয়তী আইন যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে স্বয়ং মুহাম্মদ এই কঠোর শাস্তিটি প্রদান করেন ও নিজের তত্ত্বাবধানে কার্যকরও করেন যেনাকারীর (ব্যভিচারী) ওপর। কীভাবে এই মৃত্যুদণ্ডটি কার্যকর করা হবে সে প্রসঙ্গে মুহাম্মদের নির্দেশ ছিল। ব্যভিচারিণীকে বুক পর্যন্ত গর্তে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে তার মাথা লক্ষ্য করে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। শরিয়তের এই রক্ত হিম করা নৃশংস পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করেছে ইরানের সর্বোচ্চ আদালত 'শাকিনেহ মোহাম্মদি আশতিয়ানি' নামের একজন মহিলার বিরুদ্ধে। এই একই শাস্তি ব্যভিচারীর জন্যে অর্থাৎ পুরুষের জন্যে থাকলেও তা কার্যকর করার পদ্ধতিতে বিরাট পার্থক্য রাখা হয়েছে। তার (পুরুষের) বেলায় গর্ত করে তাকে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ নেই। অর্থাৎ তার হাত দুটো উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যার সাহায্যে সে মাথা বাঁচাতে পারে, এমনকি সে যাতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে সে সুযোগও তার সামনে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সে যদি পালিয়ে যায় তবে তাকে ধরে এনে সেই শাস্তি কার্যকর করতে হবে এমন নির্দেশেরও উল্লেখ নেই মুহাম্মদের বিধানে।

শরিয়তী আইনে ব্যভিচারিণীর শাস্তি একশ-বার বেত্রাঘাত সে যদি অবিবাহিত হয়। বেত্রাঘাত লোক দেখানো নয়, নির্দয়ভাবে এবং দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বেত্রাঘাত করতে হবে। যে এই শাস্তি কার্যকর করবে তাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে একথা বলে যে, সে যেন অপরাধীর প্রতি দয়াশীল ও সহানুভূতিশীল না হয়ে পড়ে। না, এই কঠোর ও নির্দয় হওয়ার নির্দেশ ধর্মীয় নেতাদের পাষাণ হৃদয়-প্রসূত নয়, এই নির্দেশ স্বয়ং আল্লার। কোরানে কীভাবে নির্দয় হয়ে বেত্রাঘাতের আদেশ দিচ্ছে তা দেখা যাক্‌, "যেনাকারিণী ও যেনাকারী, তাহাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাহাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনিয়া থাক। মুমিনগণের একটি দল যেন তাহাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (২৪:২)। কোরানের এই নির্দেশ অনুসারে বেত্রাঘাতের ফলে বহুক্ষেত্রে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই আইনটি না থাকলেও গ্রামের সমাজ জীবনে এর প্রয়োগ চলে অবাধে। এই আইনের শিকার প্রধানত মুসলিম নারীরাই, সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি বেসরকারী সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্টে এই খবর উঠে এসেছে।

ইসলাম ধর্ম নাকি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, এমন দাবির কথা নিরন্তর শুনে শুনে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। তা এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মে নারীর প্রতি এত বৈষম্য ও অবিচার কেন? প্রশ্নটি মোটেই কঠিন নয় এবং উত্তরটিও অতি সরল ও সহজ। ইসলামের আর্বিভাবের সময়ে আরবে নারীরা অনেকটাই স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করলেও সমাজে মূল আধিপত্য ছিল পুরুষদেরই অর্থাৎ আরবের সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিকই। মুহাম্মদ সেই

পুরুষতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি এবং চিন্তা-ভাবনায় ও মননে তিনি নিজে ছিলেন একজন আপাদ-মস্তক কট্টর পুরুষতান্ত্রিক। তিনি বরং তৎকালীন সমাজের অধিপতিদের চেয়ে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-ধারা ও বিচার-ধারার ক্ষেত্রে আরও অধিক কট্টর ও রক্ষণশীল ছিলেন। একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ হয়েও তাঁকে নারীর আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছিল। তাঁর প্রথম পত্নী খাদিজা ছিলেন তাঁর মনিব। খাদিজা তাঁকে প্রথমে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর বাণিজ্য দেখভাল করার জন্যে। পরে খাদিজা তাঁকেই বিয়ে করেন। একজন নারীমনিবের অধীনে কাজ করার ফলে মুহাম্মদের পুরুষালি আত্মগরিমায় আঘাত লাগা খুব অস্বাভাবিক নয়। ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে তাঁর মনের ভিতর ক্রমাগত যে ক্ষরণ হয়েছিল সেটাই তাঁকে হয়তো সে যুগের তুলনায় অনেক বেশী পুরুষকেন্দ্রিক এবং নারীবিদ্বেষী করে তুলেছিল। না, বিরোধী বা বিধর্মীদের এসব নিছক কাল্পনিক অভিযোগ বা অনুমান নয়। শরিয়তী আইন শুধু নয়, শরিয়তী দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির মধ্যে দৃষ্টিপাত করলেও এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে মুহাম্মদ ছিলেন কট্টর পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ এবং প্রচন্ড নারী বিদ্বেষী ও নারী বিরোধী। মুহাম্মদ নারী-নেতৃত্বকে চিরদিনের জন্যে বাতিল করে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।' (বোখারী শরীফ, হাদিস নং-৩৩৬৬)। শুধু নেতৃত্ব থেকে অবনমন নয়, তিনি নারীকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একেবারে গৃহবন্দী করে দিয়েছেন চিরতরে। তিনি বলেছেন, "নারী অবস্থান করবে গৃহকোণে।" (কোরান-৩৩:৩৩)। নারীকে বলেছে তাদের মসজিদেই নামাজ পড়া উত্তম। (হাদিস-ঐ, হাঃ নং-৩১০)। মৃত সন্তানদের সৎকারের কাজে নারীদের অংশ গ্রহণ এবং গোরস্থানে যাওয়াও নিষিদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। নারীর এই অধিকারগুলি সবই ছিল প্রাক-ইসলাম যুগে আরবে। মুহাম্মদকে টানা প্রায় তিন দশক খাদিজার আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছিল। খাদিজা, তাঁর প্রথম পত্নী, যতদিন জীবিত ছিলেন, মুহাম্মদ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন নি, খাদিজার এমনই প্রবল আধিপত্য ছিল তাঁর ওপর। এই ঘটনাই কী মুহাম্মদকে নারীর প্রতি প্রবল বিরূপ এবং প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল? নারীর প্রতি যেসব আরও অবমাননাকর বিধান তিনি দিয়েছেন এবং নারীর প্রতি আরও যেসব অপমানকর ও আপত্তিকর উক্তি করেছেন তা থেকে এরূপ ধারণা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

অন্য সকল ধর্মের (religion) চোখে নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য বৈ নয়। ইসলাম তার থেকে আলাদা তো নয়ই, বরং এই ধর্ম নারীকে এমনই এক পণ্য বানিয়েছে যে তাকে যেমন খুশি ও যখন খুশি ভোগ করা পুরুষের অধিকার। এবং নারী যদি পুরুষের সেই ইচ্ছা ও অধিকারে এতটুকু ব্যত্যয় ঘটায় তবে তার জন্যে ইহকালে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ঘোষণা করেছেন 'নারীর মুক্তিদাতা' মুহাম্মদ। নারী যে পুরুষের ভোগ্যবস্তু সে কথা আকারে-ইঙ্গিতে নয়, একেবারে সরাসরি বলা হয়েছে। আল্লা পুরুষদের সুখবর দিচ্ছে, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত, তোমাদের ক্ষেতে ইচ্ছামতো যাইতে পারো।" (কোরান-২:২২৩)। কোরানের এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ এইভাবে—'ইহুদীরা বলত স্ত্রীর সাথে পেছনের দিক থেকে সঙ্গম করলে সন্তান বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন বা বিকলাঙ্গ হয়, তাই আল্লাহ

তা'আলা এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন—'তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।" (বোখারী শরীফ, হাদিস নং-১৮৬৯)। পুরুষ যদি তার পত্নীকে ভোগ করার নিমিত্ত তাকে শয্যায় আহ্বান করে তবে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্য ব্যয়ে পতির শয্যায় যাবার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পত্নীকে। মুহাম্মদ স্বয়ং কী নির্দেশ প্রদান করেছেন তা শোনা যাক্, "স্বামী যদি বিছানায় স্ত্রীকে ডাকে এবং স্ত্রী তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে, যদ্দরুণ স্বামী অসন্তুষ্টির সহিত রাত্রি যাপন করে, তবে সেই স্ত্রীর রাত্রি এই অবস্থায় অতিবাহিত হয় যে, ফেরেশতাগণ রাতভোর পর্যন্ত তার প্রতি লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করতে থাকেন।" (বোখারী শরীফ, হাদিস নং-১১১৫, ২১২৩, ২১২৪)। ফেরেশতাগণ (যারা আল্লার দূত, আগুনের তৈরি এবং দৃশ্যমান নয়) অভিসম্পাত শুধু বর্ষণ করে তাই নয়, সেই অবাধ্য পত্নীকে পেটাবার অধিকার (নির্দেশ বলাই বেশী সঙ্গত) পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তার পতিকে। আল্লা পুরুষকে বলছে, "যখন তাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তখন উপদেশ দাও, শয্যা বর্জন কর, প্রহার কর।" (কোরান-৪:৩৪)। কোরানের এই আয়াতকে ভিত্তি করেই তৈরি আরব আমিরশাহীর সংবিধান অনুসারেই সে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি সেই রায়টি প্রদান করেছে যে পুরুষের তার পত্নী ও কন্যাদের পেটানোর অধিকার রয়েছে। পুরুষকে পত্নী পেটানোর অধিকার কেন প্রদান করা হয়েছে তার উত্তরও রয়েছে কোরানের সেই আয়াতেই—"পুরুষগণ নারীদের কর্ত্তা, ... আর তাহারাই (পুরুষেরা) সম্পদ ব্যয় করে, তাই সতী নারী অনুগত হয়।" এই উত্তরে এটা স্পষ্ট যে, পুরুষ যেহেতু ভরণ-পোষণ বহন করে তাই পুরুষ নারীর কর্ত্তা, সুতরাং পত্নীকে প্রহার করার অধিকার তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এবং একমাত্র সেই নারীই সতী যে তার পতির অনুগত ও প্রহারে অসন্তুষ্ট হয় না এবং প্রতিবাদও করে না। কোরান-হাদিসের এসব অমৃত বাণী অনুসারে এটাই প্রতীয়মান হয় যে নারী উপাদেয় ভোগ্যপণ্য এবং পুরুষ উপভোক্তা। উপভোক্তার যেমন ভোগ্যপণ্যকে যেভাবে খুশি, যেমন খুশি, যত খুশি ভোগ করার অবাধ অধিকার থাকে, কিন্তু পণ্যটির কিছুই বলার থাকে না, ঠিক তেমনই পুরুষ হলো নারীর উপর একচেটিয়া অধিকার সম্পন্ন মনিব। শুধু কী তাই? বারবার ব্যবহারের পর কখনো অরুচির উদ্রেক হলে উপভোক্তা যেমন স্বাধীনভাবে অবাধে কোন পণ্যকে বাতিল বা পরিত্যাগ করার অধিকার রাখে এবং পণ্যটির কিছু বলার বা করার থাকে না, ঠিক তেমনই পুরুষ ও নারীর সম্পর্কটি। পুরুষ হলো উপভোক্তা এবং নারী ভোগ্যপণ্য। ঠিক এই একই চিন্তা-ধারা, বিচার-ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন তথা শরিয়তী আইন, অনুশাসন ও সংস্কৃতির পশ্চাতে। ইসলাম তাই নারীর সকল অধিকার ও ক্ষমতা কেবল খর্ব বা হরণই করেনি, প্রতি পদক্ষেপে নারীকে করেছে অপমান এবং নারীর অবনমন ঘটিয়েছে কার্যত দাসত্বে। প্রকৃত বিচারে 'ইসলাম' নারীকে পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছে।

মানুষের সহজাত ও স্বভাবজাত ধর্ম ও প্রবণতা হলো অন্যায়-অবিচার-শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদ করা। নারীর সেই ভিতরের শক্তি ও প্রবণতাগুলি তাই পুরুষ প্রথমে কুকৌশলে নষ্ট বা ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। পেরেছেও। নারী যাতে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে

না পারে তার জন্যে তার মাথায় অজস্র কলঙ্কের বোঝা চাপানো হয়েছে যার ভারে জন্ম থেকেই নারীর মাথা নিম্নাভিমুখী থাকে। একাজ শুধু ইসলামই করেনি। পৃথিবীর সব ধর্মগুরুরাই করেছেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মও তাই করেছে। এই দুটি ধর্ম সম্পর্কে মুহাম্মদের বিশদ জ্ঞান ছিল। নারীকে মানসিক দিক থেকে দুর্বল, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করার জ্ঞান ও শিক্ষা সেখান থেকেই তিনি আহরণ করেন এবং চাতুর্যের সঙ্গে নিজের দক্ষতা ও নিপুণতা দিয়ে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেন। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম বলেছে, নারী হলো নরকের দ্বার। এই ভয়ঙ্কর অভিযোগের সপক্ষে গল্প বানিয়েছে 'আদম ও ঈভের' গল্প। এই গল্পে 'আদম' ঈশ্বরের অতিশয় বাধ্য, নির্লোভ ও অবোধ বালক। ঈভ এক অবাধ্য, লোভী ও বিশ্বাসঘাতক নারী। সেই লোভের বশে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শুধু তাই নয়, সেই ভ্রষ্টতার পথে টেনে নামিয়েছে আদমকেও। আদমকে বিপথগামী হতে প্ররোচিত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিপথগামী করে তাকেও ভ্রষ্টাচারী করে ছেড়েছে। ঈশ্বর তখন রুষ্ট হয়ে ওদেরকে অশান্ত ও দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-লাঞ্ছিত মর্তে নিক্ষেপ করে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করে। এই গল্প বানানো হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্যে যে পার্থিব জগতের সকল মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার প্রভৃতির উৎস হলো নারী। নারী তাইতো নরকের দ্বার, পুরুষরা তোমরা নারীকে বিশ্বাস কোরো না, নারী থেকে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকবে, নারীকে সর্বদা চোখে চোখে রাখবে, শাসনে রাখবে, অধীনে রাখবে, নারীর পরামর্শ নেবে না ও নারীকে মাথায় চাপতে দেবে না, নারীই যতো সর্বনাশের হোতা—একথা মূহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হবে না—প্রভৃতি কত যে সাবধান-বাণী রয়েছে পুরুষের জন্যে তার ইয়ত্তা নেই। বাইবেলের সেই 'আদম-ঈভের' গল্প এবং সেই গল্প থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে আল্লার নামে কোরান ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। 'আদম-ঈভের' স্থানে কোরানে রয়েছে 'আদম-হাওয়া'র গল্প। প্রায় হুবহু একই গল্প। দুজনেই ছিল স্বর্গের অধিবাসী, উভয়েই ভোগ করছিল অনন্ত সুখ, শান্তি ও আরাম-আয়েসের জীবন। ঈভের মতো হাওয়া একই পথে আদমকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে এবং আল্লার বিশ্বাসকে হত্যা ও আদেশকে লঙ্ঘন করে। আল্লা তখন তাদেরকে বেহেস্ত (স্বর্গ) থেকে বহিষ্কার করে পাপক্ষালন করতে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-লোভ-হিংসায় পরিপূর্ণ নরক-সদৃশ মর্ত তথা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে। সুতরাং নারীই যতো নষ্টের গোড়া। কোরানের সেই 'আদম-হাওয়া'র গল্প থেকে মুহাম্মদ উপসংহার টেনে নারী সম্পর্কে পুরুষকে হাজারো প্রকার সাবধান বাণী বিতরণ করেছেন। সেই অমৃত-বাণীগুলোর কয়েকটি নমুনা এরূপ ঃ মুহাম্মদ নারীকে বলেছেন কুলক্ষণা, "কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলেন—যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে ঘরের মধ্যে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে ও ঘোড়ার মধ্যে।" নারীকে তিনি পুরুষের জন্যে 'ফিতনা' (ফ্যাসাদ/অত্যাচার) বলে বর্ণনা করেছেন—"তিনি ইরশাদ করেছেন, আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা বাকি রইল না।" 'ইরশাদ' মানে বর্ণনা। এই হাদিস দুটি নেওয়া হয়েছে বোখারী হাদিস থেকে এবং হাদিস নম্বর দুটি যথাক্রমে ২০৫৪ ও ২০৫৬। মহিলাদের প্রতি চরম অবিশ্বাস ব্যক্ত করে মুহাম্মদ পুরুষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এভাবে—"সাবধান! মহিলাদের সাথে অবাধে দেখা সাক্ষাত করবে না।" "স্বামী

ছাড়া অন্য লোকের সামনে যে নারী সাজসজ্জা করে আকর্ষণীয় পোশাকে আবির্ভূত হয় সে কিয়ামতের দিনের অন্ধকার তুল্য।" পুরুষ নিশ্চয় আতর (সুগন্ধী) লাগাবে, কিন্তু নারী কদাচিত নয়, কারণ, "হযরত রাসুলে পাক (স) বলেছেন : প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোন মহিলা যদি আতর লাগিয়ে কোন বৈঠকের পাশ দিয়ে যায় তবে সে হল এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।" এই মধুর (!) বাচনগুলি "তিরমিযী শরীফ" থেকে উদ্ধৃত করা এবং হাদিসগুলির নম্বর হলো যথাক্রমে ১১০৯, ১১০৫ এবং ২৭৮৬। নারী-নেতৃত্ব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে অতি কঠোরভাবে,—"সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না। যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।" (বোখারী শরীফ, হাঃ নং ১৮০৩ এবং ৩৩৬৬)। এরূপ আরও অসংখ্য মণি-মুক্তা (!) বিতরণ করে গেছেন মুহাম্মদ। এসব কথা মুহাম্মদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে অবিরাম ধারায়। মুহাম্মদ তো সাধারণ কোন ব্যক্তি নন, তিনি আল্লার প্রেরিত শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (দূত) এবং আল্লার বিশ্বস্ত। তাই তাঁর কথাগুলিতে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তির সঞ্চার হয়েছে। আল্লা বলেছে, আল্লার কথা মুহাম্মদ বলেছেন, তারপর শত-সহস্র কণ্ঠে পুরুষরা সে কথাগুলি ঝর্ণা-ধারার মত অবিরাম বলেছে, সুতরাং নারী না বিশ্বাস করে পারে? নারী বিশ্বাস করেছে; নারীর মধ্যে তৈরি হয়েছে অপরাধবোধ, পাপবোধ; অনুশোচনা, অনুতাপের আগুনে নারী দগ্ধ হয়েছে; এভাবেই নারী মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছে; সে দুর্বল ও হীনবল হয়েছে এবং অবশেষে বশ্যতা মেনেছে কোরানের কাছে, এবং অবশ্যই পুরুষের কাছে। ইসলাম তাই অবলীলায় তার ওপর আরোপ করেছে হাজারো বিধি-নিষেধ আর কর্তব্য-কর্ম। ইসলাম তার পায়ে বেড়ি পরিয়ে বলেছে 'গৃহের মধ্যেই তুমি অবস্থান করবে। বেশ-বিন্যাস করবে না।' (কোরান-৩৩:৩২)। শুধু গৃহবন্দীই নয়, নারীকে হিযাববন্দী থাকার বিধি আরোপ করা হয়েছে। (কোরান, ৩৩:৫৯)। নারীকে বলেছে পতির অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাইরে বের হবে না; অনাত্মীয় ও অচেনা পুরুষের সামনে যাবে না; নারী তুমি পুরুষের মতো জোরে কথা বলবে না, অট্টহাসি হাসবে না; পুরুষের মতো স্কুল-অফিস-আদালতে বা মাঠ-ময়দানে বা কল-কারখানায় উপার্জন করতে যাবে না; পুরুষের মতো খেলার মাঠে গিয়ে তুমি খেলবে না; এরূপ অজস্র নিষেধাজ্ঞায় নারীকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। শুধু 'এটা না, ওটা, সেটা না'—এরূপ নিষেধাজ্ঞাই নয়, তার সাথে নারীকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে 'এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, সেটা করতে হবে।' নারীর প্রধান কর্তব্যটি যে পতিসেবা করা, পতির মনোরঞ্জন করা, পতির সংসারে দাসীবৃত্তি করা তা বলাই বাহুল্য। নারী কেন শুধু পতিসেবা করবে, এ প্রশ্ন নারী যেন তুলতে সাহস না প্রদর্শন করে তার জন্য সব ধর্মই বলেছে, ঈশ্বর তো সে কাজের জন্যই নারীর সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাসী নারীর মুখ খোলার পথটি রুদ্ধ। ধর্মগুরুদের এই চাতুরীপূর্ণ গল্পটি মুহাম্মদও শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন আদমের সুখ-সম্ভোগ মেটানো ও সেবা করার জন্যে আল্লা আদমের বুকের পাঁজরের একটি হাড় থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। (দ্রঃ- বোখারী শরীফ, হাদিস নং-২১১৯)।

নারী যদি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, কিংবা কর্তব্য পালনে ত্রুটি বা অবজ্ঞা করে? না, ইসলাম এসব নারীর বিচার, বিবেচনা বা মর্জির ওপর ন্যস্ত করেনি। তার জন্যে শাস্তির, ক্ষেত্রবিশেষে

অতি কঠোর শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেছে। শাস্তি তার জীবদ্দশায়, মরণের পরেও। পার্থিব জগতে শাস্তি দেবে পুরুষ, আর পরকালে আল্লা। পুরুষ কেন শাস্তি দেবে এমন প্রশ্ন তোলার পথ রাখেনি নারীর জন্যে। স্বয়ং আল্লা যে পুরুষকে নারীর কর্তারূপে সৃষ্টি করেছে। (দ্রঃ কোরান-৪:৩৪)। নারীর জন্য কীরূপ শাস্তির বিধান করা হয়েছে? নারী পুরুষের/পতির অবাধ্য হলে, পতি তাকে প্রহার করবে (সূত্র-ঐ)। প্রহারের পরও অবাধ্যতা থাকলে পতি তাকে বর্জন (তালাক) করবে। পুরুষ অবশ্য বিনা কারণেও তালাক দিতে ক্ষমতাশালী। নারী যদি আল্লার বিধানের অবাধ্যতা করে তবে তাকে চাবুক দ্বারা নির্মমভাবে প্রহার করবে। (কোরান-২৪:২)। এই বিধান ব্যভিচারের জন্য। এই দোষে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। (কোরান-৪:১৫)। কিংবা পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যার বিধানও অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের হাতে। (সূত্র : সবগুলি হাদিসে এটা রয়েছে)। ইসলামী সাধারণ অনুশাসন লঙ্ঘন করলে নারীকে শাস্তি দেবে তার পুরুষ অভিভাবক—পিতা অথবা পতি। তারা যদি ব্যর্থ হয় তার জন্যে দায়িত্ব-প্রাপ্তরা হলেন শরিয়তের পুলিশ তথা ইমাম-মৌলানা-মুফতির দল। তাঁরা কওমি মাদ্রাসা বা খারিজি মাদ্রাসার ছাত্র কিংবা শিক্ষক। আফগানিস্তানে তালিবান আমলে এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটেছে—নারী বোরখা না পরে রাস্তায় নেমেছে বলে রাস্তার মাঝেই তাকে চাবুক দিয়ে পেটানো হয়েছে; নারী ঠোঁটে লিপষ্টিক পরেছে বলে এ্যাসিড ছুঁড়ে তার মুখ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; নারী পুরুষ-ডাক্তারের কাছে গিয়েছে বলে তার পায়ের ধমনী কেটে দেওয়া হয়েছে; আবার কখনও তার গলার ধমনী কেটে দিয়ে পিঁপড়েকে টিপে মারার ঢঙে অবলীলায় হত্যা করা হয়েছে। এসব তালিবানি শাসনে হতো, এখন আমেরিকার তৈরি পুতুল সরকার তথা কারজাই সরকারের আমলেও সমানে চলছে। একই অবস্থা জারি রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, আলজিরিয়া, আরব আমিরশাহী প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রে। তাইতো আরব উপদ্বীপের আকাশ-সীমায় প্রবেশ করলেই ক্ষিপ্রগতিতে মুসলিম নারীদের নিজেদের পছন্দের পোশাক খুলে ফেলতে হয় এবং ঢেকে দিতে হয় কালো রঙের আপাদ-মস্তক ঢাকা হিযাব বা বোরখার আড়ালে। বাড়ি থেকে বোরখা পরে রাস্তায় নামার কিছুদূরে বোরখা খুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে স্বাধীনভাবে পথচলা, আবার বাড়ি ফেরার পথে বাড়ীর কাছে গিয়ে ব্যাগ থেকে বোরখা বের করে পুনরায় তা পরিধান করে বাড়িতে প্রবেশ করা—এ দৃশ্য আমাদের মহান ধর্মনিরপেক্ষ ও বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে তো আমাদের খুবই চেনা। এটা তো আমাদের সকলেরই জানা—মুসলিম নারীরা বোরখা পরতে চায় না তবু পরে, পরে তো ভয়ে, ঐ শরিয়তী-পুলিশ বাহিনীর ভয়ে যারা শরিয়তী-চাবুক নিয়ে সদা প্রহরারত এবং তাদের সুরক্ষায় সদা প্রহরা দিচ্ছে আমাদের মহান দেশ এবং তার মহান রাষ্ট্র নেতারা। তামাম বিশ্বে মুসলিম সমাজে যেখানে অর্ধেক মানব-শক্তির গৃহ-বন্দী ও হিযাব-বন্দী অবস্থায় এভাবে শুধু শুধু আল্লার নামে অপচয় হয় তাদের ক্রমাগত পশ্চাদগমন ও অধোগতি রোধ করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা ইসলামে অনেক কম। আসল কথা হলো, একেবারেই নেই। কোরান-হাদিসের, কিংবা আল্লা ও তার মুহাম্মদের সমালোচনা বা বিরোধিতা করলে সে কাফের এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুসলিম সমাজের কেউ অনুরূপ

আচরণ করলে সে 'মরতাদ' এবং তার শাস্তিও মৃত্যু। সেজন্যে সলমন রুশদি ও তসলিমা নাসরিনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্নদেরও মাথায় মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া নিয়ে দেশে দেশে পুলিশি প্রহরায় বাঁচতে হয়, না-হলে তাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ওৎ পেতে রয়েছে শরিয়তের সশস্ত্র সেনা-সামন্তরা। এর ফলে যা হবার তাই হয়েছে—সমগ্র বিশ্বে মুসলিম সমাজে মুক্ত-চিন্তা, মুক্ত-বুদ্ধি, মুক্ত-বিচার এবং মুক্ত-শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা একেবারে স্তব্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী সাম্রাজ্যে শরিয়তী একনায়কতন্ত্র ও গোঁড়ামি সেই যে স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মুক্ত যুক্তি-বুদ্ধি, বিজ্ঞান শিক্ষা-গবেষণা এবং মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চার সকল ক্ষেত্র ও পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল সে পথ আজও রুদ্ধই রয়ে গেছে। তাইতো বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা চিন্তা-চেতনা, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সবচেয়ে দীন ও হীন। এই দীনতাই যে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ তা বলা বাহুল্য।

সমুদ্রের জলে ও জলের তলে, ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে এবং মহাকাশে থরে থরে সাজানো রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের মহাভাণ্ডার। মানুষ সেই প্রাকৃতিক মহাভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করতে জানত না বলে মানুষের জীবন-যাত্রা ছিল অতি নিম্ন মানের। এখন বিপুল জনসংখ্যা, তবু মানুষের জীবন-যাত্রা কত উন্নত, কত আধুনিক, কত প্রাণবন্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ এখন বিশ্ব-প্রকৃতির মহাভাণ্ডার থেকে পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করে তা সম্ভব করে তুলছে। যে দেশ যত বেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করেছে সে দেশ তত বেশী সেই সম্পদ আহরণ করেছে এবং ধনশালী ও শক্তিশালী হতে পেরেছে। সেই ধনশালী ও শক্তিশালী দেশগুলি তাদের ধন ও শক্তির প্রাচুর্য ব্যবহার করে দুর্বল দেশগুলির উপর শাসন ও শোষণ প্রতিষ্ঠা করে ক্রমাগত নিজেদের ধন, সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। বিশ্ব-প্রকৃতি মুসলিম দেশগুলিকেও প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ করে রেখেছে অকৃপণভাবে। সব চেয়ে দামী প্রাকৃতিক সম্পদ যে "তরল সোনা" তা প্রকৃতি দু-হাত উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে। তবু এই দেশগুলিই সবচেয়ে অধিক দরিদ্র ও সবচেয়ে পশ্চাদপদ। সব চেয়ে বেশি অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অনাহার-অচিকিৎসা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা এবং হিংসা-প্রতিহিংসায় ডুবে আছে এই দেশগুলিই। এই দেশগুলিতে নেই গণতন্ত্র। আছে হয় মানুষের কণ্ঠরোধ করা আল্লাতন্ত্র, না হয় সামরিকতন্ত্র, না হয় ব্যক্তির একনায়কতন্ত্র। আল্লাতন্ত্রের ফল হয়েছে এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা, ইতিহাস-ভূগোল-দর্শনের চর্চা ও বিকাশ এবং সঙ্গীত, শিল্প-কলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে হারাম (অবৈধ) জ্ঞানে বর্জন করেছে ইসলামী রাষ্ট্রগুলি। এভাবে বৌদ্ধিক বিকাশ ও মেধার স্ফুরণের সকল পথ রুদ্ধ করে আত্মহননের পথকেই নির্বাচন করেছে। জ্ঞান এবং রুটি-রুজি-সবকিছুর মালিক আল্লা — কোরানের এই শিক্ষা ও বাণীকে নির্ভুল ও চরম সত্য মেনে সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছে আল্লার উপর। ধর্মীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র মানুষকে বাণী দিয়ে চলেছে, তোমাদের যা কিছু আছে সবকিছু নিয়ে আল্লার পায়ে আত্মসমর্পণ করো এবং যা কিছু চাইবার আছে সব তারই কাছে চাও। তাই বিশ্বজুড়ে মুসলিম সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধি ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনার বদলে

দিনরাত চলে শুধু আল্লার এবাদত (উপাসনা)। তারা মগ্ন কেবল রোজা-নামাজে, মগ্ন সবেবারাত ও সবে কদরের রাত্রি উদযাপনে, আর মগ্ন বছরব্যাপী মিলাদ-মেহ্ফিল ও কোরান তেলাওয়াতে (পাঠ)। ফলে বিশ্ব-প্রকৃতির মহাভাণ্ডার থেকে পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণ করতে যে জ্ঞান এবং কারিগরি কলাকৌশল ও যোগ্যতা-দক্ষতা আবশ্যক তা অর্জন করতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। শরিয়তী ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল দর্শন ও চিন্তাধারা যদি দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবদের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণা এবং দর্শনের চর্চার পথরোধ না করতো তবে মুসলিম-বিশ্বের আজ যে শোচনীয় ও করুণ পরিণতি হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই হতো না—এ কথা একেবারেই সংশয়াতীত। প্রকৃত ও পর্যাপ্ত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবেই তেল-সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলি আজও শিল্পে সবচেয়ে পশ্চাদপদ। পিন থেকে প্লেন সবই তাদের আমদানি করতে হয়। অঢেল অর্থ ব্যয় করে আমদানি করতে হয় দক্ষ কারিগর, ইঞ্জিনিয়র ও চিকিৎসকদের মতো উচ্চ মেধা ও শিক্ষাসম্পন্ন প্রতিভাদের। আর তাদের দেশের যাবতীয় মেধা ও প্রতিভার অকাল মৃত্যু হচ্ছে কোরান ও হাদিসকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। গোটা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে সকল ক্ষেত্রে মানব সমাজকে উপহার দিচ্ছে নিরন্তরভাবে অজস্র বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সর্বোচ্চ মেধা ও প্রতিভার মহা মহা নক্ষত্রদের যাঁরা মানব সভ্যতার বিকাশকে ক্রমাগতভাবে অবিশ্বাস্য উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে। তাঁদের সকল গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শাখায় নিরন্তর ঘটে চলেছে একটার পর একটা বিপ্লব। কিন্তু খুবই লজ্জা ও বেদনার বিষয় হলো এরূপ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও বিপ্লবে মুসলিম দেশগুলির অবদান অতিশয় নগণ্য। এর বিপরীতে তারা বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে ইমাম আর মোল্লা-মুফতিদের হাজারে হাজারে, যারা একদিকে হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, আর অপরদিকে মুসলিমদের পান থেকে চুণ খসলেই ফতোয়ার কড়া চাবুকে গোটা সমাজ শরিয়তী শবক শেখাতে ব্যস্ত। কাজী নজরুল ইসলাম তাই তীব্র কশাঘাত করেছিলেন মুসলিম সমাজকে তাঁর কবিতায়—"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে/ বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি কোরান ও হাদিস চযে।" মুসলিম দেশগুলিকে তাই তাদের ভ্রান্ত পথের মাশুল গুণতে হয় প্রতি পদক্ষেপে। কোনো একটা দেশও আজ পর্যন্ত আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের নির্ভর করতে হয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর। অপর দিকে নিজেরা, ধর্মীয় প্রবল মতাভেদের কারণে সর্বদা মত্ত থাকে আত্মকলহে। নিজেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতেও পিছপা হয়না এমনই তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এ প্রসঙ্গে ইরাক ও ইরানের যুদ্ধ, এবং ইরাক-কুয়েতের যুদ্ধ স্মরণীয়, স্মরণীয় ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যেকার প্রবল ধর্মীয় মতবিরোধজনিত পারস্পরিক বৈরিতা। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কলহের সুযোগ নিচ্ছে বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তান ও ইরাককে ধ্বংস ও পদানত করে আমেরিকা এখন নিশানা করেছে ইরানকে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে পদানত করে তাদের বিপুল তেল-ভাণ্ডারের দখল নেওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকা যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে নানা অজুহাতে তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। এসব যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির বোধগম্যের বাইরে তা নয়, সব জেনেও তারা মার্কিনী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না।

তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের আপন আপন গোঁড়ামিপূর্ণ শরিয়া মতবাদ। এই কারণে বিশ্ব-মুসলিম সমাজ এখন বহুধা বিভক্ত। মুসলিমরা যদিও বিভক্ত বহু গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীতে, কিন্তু সর্বোপরি তারা বিভক্ত দুটি মূল ধারায়। একটি ধারা সুন্নী মতবাদের, অপরটি শিয়া মতবাদের। মুসলিমরা এই দুটি ধারায় পরস্পর পৃথক হয়ে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল মূলত ক্ষমতার মসনদ দখলের জন্যে। পঞ্চম খলিফা আমির মুয়াবিয়া একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে। এই মনোনয়নে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মুহাম্মদের ছোট নাতি ইমাম হোসেন। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ খলিফার আসনে আরোহণ করলে হোসেন বিদ্রোহ করেন। তিনি নিজেই খলিফা হবার অভিপ্রায়ে একটি সৈন্যদল নিয়ে কুফা শহর অভিযান করলে কারবালা ময়দানে ইয়াজিদের হাতে পরাস্ত ও নিহত হন। তখনই মুসলমানরা প্রথম সরাসরি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা দল হোসেনের পক্ষ অবলম্বন করে, অন্যদল ইয়াজিদের। প্রথম দলটি 'শিয়া' ও অপর দলটি 'সুন্নী' নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। যতদিন গেছে তাদের বিরোধ ও শত্রুতা তত বৃদ্ধিলাভ করেছে। তাদের বিরোধের প্রধান কারণ দুটি। প্রথমটি খলিফা পদ নিয়ে। খলিফা কথার অর্থ হলো মুহাম্মদের প্রতিনিধি, যিনি হবেন পদাধিকার বলে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রশাসক বা কর্ণধার। শিয়াদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অভিমত হলো, মুহাম্মদের প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকার হতে পারে শুধু তাঁর বংশধরগণ অন্য কেউ নয়। সুতরাং মুহাম্মদের মৃত্যুর পর একমাত্র তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই আলী এবং তারই একমাত্র খলিফা হবার অধিকার ছিল। কিন্তু মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তড়িঘড়ি করে প্রথম খলিফা মনোনীত করা হয়েছিল আবু বকরকে। আবু বকর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে খলিফা মনোনীত করেন ওমর ফারুককে এবং ওমর ফারুক তৃতীয় খলিফার মনোনয়ন দেন ওসমানকে। শিয়াদের মতে এই তিনজন খলিফা ছিলেন অবৈধ। দ্বিতীয় বিরোধটি কোরান নিয়ে। কোরান সংকলন করেন তৃতীয় খলিফা ওসমান গণি। সুন্নীদের বিশ্বাস এই কোরানটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কোরান এবং এই কোরানটাই স্বয়ং আল্লার কাছে বেহেস্তে সংরক্ষিত আছে। শিয়ারা সেটা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে কোরানের কিছু অংশ পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছে, কিছু অংশ বিকৃত করা হয়েছে এবং কিছু মনগড়া কথা কোরানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরানটি জাল। তাইতো শিয়া ও সুন্নীরা শুধু পৃথক গোষ্ঠীই নয়, যুযুধান গোষ্ঠীও। তাই সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে পারস্পরিক যে সব স্বার্থগত বিরোধ রয়েছে সেগুলি গৌণ ও অবৈরীমূলক, ওদের মুখ্য ও বৈরীমূলক দ্বন্দ্বটিই হলো শরিয়া-দ্বন্দ্ব। সৌদি আরব গোঁড়া সুন্নী মতবাদের প্রতিভু আর ইরান শিয়া মতবাদের। তাই ওরা পরস্পর চিরশত্রু। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিও এই শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বে জেরবার। এসব দেশে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার খবর প্রায়শই শোনা যায়। এভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, না হয় দেশের অভ্যন্তরে এক দল অন্য দলের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত। এভাবে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে নিজে নিজেরাই ধ্বংসের পথে ধাবমান। তাই তাদের পক্ষে উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির চাপানো শোষণ জাল ছিন্ন করা কিংবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

দৃষ্টি ফেরানো যাক ভারতের মুসলমানদের প্রতি। এই আলোচনা যদিও মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রসঙ্গে, কিন্তু আলোচনাটির লক্ষ্য মূলত ভারতের মুসলিম সমাজ। ভারতের মুসলিমদের অবস্থা অন্যদের তুলনায় সর্বাধিক শোচনীয় তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কেন এ অবস্থা? প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার সত্যিকারের প্রয়াস বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্বে সবচেয়ে পশ্চাদপদ ছিল পাহাড়-জঙ্গলের আদিবাসী ও অসংখ্য ছোট ছোট উপজাতির জন সম্প্রদায়। এখন তাদের থেকেও পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে মুসলমানরা। কেন এ ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্য অবনমন? এর পশ্চাতে মুসলমানদের নিজস্ব কোন দায় আছে কিনা তা জানার জন্যে মুসলিমদের আত্মসমীক্ষা করার প্রয়াসও নজরে পড়ে না। তার পরিবর্তে সব দোষ আরোপ করা হয় সরকারের ওপর। সরকার মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে, তাদের ন্যায্য ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে মুসলমানরা ক্রমশ পশ্চাদপদ হচ্ছে—এই অভিযোগের মূল প্রবক্তা মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতারা এবং তাদের সংগঠনগুলি। একই সুর প্রতিধ্বনিত হয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠেও। তাই সাধারণভাবেই সমগ্র মুসলিম সমাজে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে মুসলিম সমাজ এ দেশে পিছিয়ে পড়েছে রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও বঞ্চনার জন্যেই।

পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘুরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। ভারতের সংখ্যালঘুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। মুসলিমদের প্রতি এদেশে যে বৈষম্য করা হয় তা প্রশ্নোর্ধ্ব বিষয় নিশ্চয়, কিন্তু মুসলিমদের ভয়ঙ্কর পশ্চাদপদতার পশ্চাতে রয়েছে প্রধান কারণ হিসাবে সেটাই বা কতটা সত্যাশ্রিত তা ভেবে দেখার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। এই অভিযোগটি সত্যিকারের কোন সমীক্ষা বা গভীর অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত যুক্তি ও তথ্যনির্ভর এমনটা বিশ্বাস করার কারণ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অভিযোগটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মুসলিমদের শোচনীয় দুরবস্থার প্রকৃত ও প্রধান কারণ কী তা গভীরভাবে অনুসন্ধান ও আত্মানুসন্ধান করে জানাটা সবচেয়ে জরুরী।

ভারতের মুসলমানদের সাড়ে পাঁচশো বছর ব্যাপী মুসলমান শাসকদের অধীনেই বসবাস করার সুযোগ ঘটেছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খলজি বঙ্গ বিজয় করেছিলেন। তারপর বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে বিশাল ভারতের সর্বত্র মুসলমান শাসকদের সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে, যা স্থায়ী হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে মুসলিমরা কেমন ছিল সে বিষয়ে ইতিহাস যা সাক্ষ্য দেয় তা মোটেই সুখকর নয়। তখনও মুসলিমদের চেয়ে প্রতিবেশী হিন্দুরা অনেক অগ্রগামী ছিল এবং মুসলিমদের অবস্থা ছিল সেই করুণই। নবাবী আমলের একেবারে শেষপ্রান্তে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দীর সময়ে দেখা যায়, 'দেওয়ান, তলদেওয়ান, সাব-দেওয়ান, বকসী প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই অলঙ্কৃত করেছে হিন্দুরা—একমাত্র মুসলমান বকসী হলো মীরজাফর। আবার ১৯ জন জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু।' (সূত্র: মুসলিম সমাজ ও এই সময়, সম্পাদনা—মইনুল হাসান, পৃঃ ২১৩, উদ্ধৃতি)। মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলের একটা চিত্র এরূপ: "মুর্শিদ কুলী খাঁন বেশীরভাগ হিন্দুদের মধ্যে হইতেই নূতন ইজারাদার নিয়োগ করিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে

প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল এবং নূতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা এইসব উপাধি পাইলেন। এইভাবে বাংলাদেশে নূতন এক হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হইল।" (সূত্র : ঐ, পৃঃ ২১৩, উদ্ধৃতি)। শুধু ভূমিকেন্দ্রিক হিন্দু অভিজাত শ্রেণীই নয়, রমেশচন্দ্র সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাবদের প্রশাসন বিভাগের বহু উচ্চপদ লাভ করেছিলেন হিন্দুরা। একই ছবি দেখা যায় হিন্দু-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত ঔরঙ্গজেবের দরবারেও। কেন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল? মুসলিম নবাব-বাদশাগণ নিশ্চয়ই মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য করতে চাননি, কিংবা হিন্দুদের প্রতিও পক্ষপাতিত্ব করতে চাননি। তবে কীভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তারও আভাস পাওয়া যায় রমেশচন্দ্র সম্পাদিত বাংলার ইতিহাসে। সেখানে লেখা হয়েছে: "তাঁহার (মুর্শিদকুলী খান) আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দু উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অর্জন করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল।" (সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩)। মুসলিম শাসকদের সময়কালের ইতিহাস আমাদের তাই এই শিক্ষা প্রদান করে যে কোনো জাতি বা ধর্মগোষ্ঠীকে, তাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা থাকলে শুধু ধর্মের পরিচয়ের কারণে দূরে বা পিছনে সরিয়ে দেওয়া বা রাখা সম্ভব নয়। পাশাপাশি এ শিক্ষাও আমরা পাই যে, শাসক ও প্রজার ধর্ম এক হলেও মূর্খ, অশিক্ষিত ও অদক্ষ জাতি বা ধর্মগোষ্ঠীর কখনই উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে না। ফার্সী ভাষা মুসলমানদের—হিন্দুরা যদি এরূপ ভাবত এবং বর্জন করতো, কিংবা মুসলমান বাদশারা হিন্দুদের রাজ্য গ্রাস করেছে বলে তারা হিন্দুদের শত্রু—হিন্দু পুরোহিতদের এই ফতোয়া পবিত্র জ্ঞানে শিরোধার্য করতো, তবে হিন্দুরাও পিছিয়ে পড়তো। বৃটিশদের শাসনকালে কিন্তু ঠিক এই ভুলটাই করে বসে মুসলমানরা। মোল্লা সমাজের ফতোয়ায় তারা বৃটিশ জাতি, বৃটিশ সরকার এবং ইংরেজী ভাষাকে শত্রুজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। ঐ ফতোয়াটি ছিল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। অথচ সেটাই শরিয়তী দৃষ্টিভঙ্গীতে পবিত্র জ্ঞানে অনুসরণ করেছিল। এরই সাথে মোল্লাসমাজ সমগ্র মুসলিম সমাজের শরিয়তী বিশুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে শুরু করেছিল শরিয়তী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা ইতিহাসে ফারাজী আন্দোলন এবং ওয়াহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত। এই দুটি আন্দোলন মুসলিম সমাজের যা সর্বনাশ করেছে তার নজির ইতিহাসে খুবই বিরল। তারই ফলশ্রুতিতে বৃটিশ শাসনে মুসলিমরা হিন্দুদের তুলনায় আরও বহু গুণ পিছিয়ে পড়েছিল। সে সময় সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুরা কত এগিয়ে গিয়েছিল, আর মুসলিমরা কত পিছিয়ে পড়েছিল তার একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় রণবীর চক্রবর্তীর ইতিহাস গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "বাংলার জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু, রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু, আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু, দর্শক মুসলমান, জেলার হিন্দু, কয়েদী মুসলমান। সমাজ জীবনের প্রতিটি খুঁটি-নাটিতে এই পার্থক্য ছিল পল্লবিত, প্রকটিত ও প্রতিফলিত।" (সূত্র-ঐ, পৃ:-২১৯)।

ইতিহাসের এই তথ্য প্রমাণ করে প্রাক স্বাধীনতা কালে, কী বৃটিশ শাসনে কী মুসলমানদের দীর্ঘ শাসনকালে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা ধারাবাহিকভাবে ক্রমশ পিছিয়েই পড়েছিল।

সুতরাং এই অভিযোগটি বাতিল হয়ে যায় যে, স্বাধীনোত্তর ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্রের বৈষম্য ও বঞ্চনা। অপরদিকে আর একটি ছবি আমাদের সামনে স্পষ্ট দৃশ্যমান হচ্ছে, তা হলো, বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলির তুলনায় মুসলিম দেশগুলি ধারাবাহিকভাবেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। সুতরাং সাধারণ যুক্তিতেই এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার পশ্চাতে নিহিত রয়েছে একটা সাধারণ কারণ। সেই কারণটি যে মধ্যযুগীয় ও পশ্চাৎপদ শরিয়তী আইন, অনুশাসন, ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতিকে পবিত্র ও নির্ভুল জ্ঞানে অন্ধভাবে অনুসরণ করা তা নিয়ে সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

শরিয়তী চিন্তাধারা দাঁড়িয়ে রয়েছে কোরানের উপর। ১৪০০ বছরের পুরানো এই ধর্মগ্রন্থটিকে আজও মুসলমানরা বুকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে যে বিশ্বাসগুলিকে ভিত্তি করে সেগুলি প্রধানত এই রকম : (এক) কোরান মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লার রচিত। (দুই) এর প্রতিটি বাক্য ও বর্ণ নির্ভুল এবং এরূপ রচনা বা সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যের অতীত। (তিন) এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাভাণ্ডার ও অফুরন্ত উৎস যার মধ্যে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে মানবসমাজের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্যে আবশ্যক সকল প্রকার জ্ঞান বা জ্ঞানের সূত্র এবং ইতিহাসের অসংখ্য অনেক অজানা তথ্য। (চার) এটা একটি মহাপবিত্র মহাসংবিধান যার মধ্যে সন্নিবেশিত রয়েছে দেশ ও মানবসমাজ পরিচালনার জন্যে আবশ্যক আইন-কানুন ও নীতিমালা। এটা একটা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মহাসংবিধান যা সর্বকালের জন্যে সমান সময়োপযোগী। এবং (পাঁচ) মানুষ এই সংবিধানে কোনোরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন আনলে মানবসমাজে ঘোর সংকট নেমে আসবে। কোরান ও শরিয়তী জীবন-ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণার প্রতি মুসলমান সমাজের এহেন গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাভ্রান্ত এবং এর জন্যে তাদের অনেক চড়া মাশুল দিতে হয়েছে এবং আজও দিতে হচ্ছে সে বিষয়ে এই স্বল্প পরিসরে যথাসম্ভব আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে। সেই আলোচনাটাই আর একবার এক ঝলকে স্মরণ করা যাক্ যা আলোচ্য বিষয়ে উপসংহার টানার পক্ষে সহায়ক হবে।

কোরান সম্পর্কে এই একবিংশ শতাব্দীতেও মুসলমানদের মধ্যে যে বিশ্বাস বিদ্যমান তা যে অসার তা মুহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই তাঁরই সহযোদ্ধা ও অনুবর্তী খলিফাগণ উপলব্ধি করতে শুরু করেন। সেই উপলব্ধিবোধই তাঁদেরকে নিরুপায় করে তুলেছিল এমন অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যা ছিল কোরানের পরিপন্থী এবং অনেক ক্ষেত্রে কোরানের অনেক আইন ও নীতির সংশোধন করাও তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কোরানের সংশোধন, কোরানের উল্লঙ্ঘন এবং কোরানকে বর্জন করা হয়েছিল তা এক নজরে দেখা যাক।

এক) মুহাম্মদ বলেছিলেন, কোরানেই সকল সমস্যার সমাধান ও প্রতিকার নিহিত রয়েছে। সুতরাং হাদিস সংকলন করবে না। মুহাম্মদের অনুবর্তীরা উপলব্ধি করেন যে কোরান একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, তাই তাঁরা মুহাম্মদের নির্দেশ লঙ্ঘন করে হাদিস সংকলন করেন। দুই) মুহাম্মদের মৃত্যুর মাত্র ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যেই তৃতীয় খলিফা ওসমান গণি জমিদারী প্রথা প্রবর্তন

করেন। এটা কোরানের নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলে সে সময় মুসলমানদের ধর্মীয় নেতাদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি ইসলাম-অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সে সময় যে কঠিন পরিস্থিতি ও সংকটের উদ্ভব হয়েছিল তার সমাধানের জন্যে অন্য বিকল্প ছিল না বলে মুসলিম ঐতিহাসিকরাও মানেন। তিন) কোরানীয় রাষ্ট্রনীতির ব্যাপক সংস্কার করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও সংহতির স্বার্থে মুহাম্মদের মৃত্যুর মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই। এই সংস্কার করেন পঞ্চম খলিফা আমীর মুয়াবিয়া। মুহাম্মদ নির্দেশ দিয়ে যান আরব তথা ইসলামী সাম্রাজ্যকে মোশরেক (অমুসলমান) মুক্ত করতে। মুয়াবিয়া এই নির্দেশাত্মক নীতি সম্পূর্ণ বাতিল ও বর্জন করেন। তার পরিবর্তে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা হলো, (ক) 'মোশরেকদের দমন ও মুসলমানদের পালন'—এই নীতির পরিবর্তে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির প্রণয়ন। (খ) অমুসলিমদের সঙ্গে বৈরিতার সম্পর্কের পরিবর্তে সদ্ভাবের সম্পর্ক স্থাপন। (গ) রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে অমুসলমানদের অন্তর্ভুক্তিকরণ। এবং (ঘ) উপদেষ্টামণ্ডলীতে উলামার পাশাপাশি ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ পদে মনোনয়ন প্রদান। চার) ইসলামী শিক্ষানীতি একটি দেশ পরিচালনা ও সমাজের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে না তা উপলব্ধি করে এই নীতির সংস্কার করার কাজ প্রথম শুরু করেছিলেন মুয়াবিয়াই। ইসলামী শিক্ষানীতির মূল কথা, ইসলামী নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনই হলো জ্ঞানার্জনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সংকীর্ণ নীতির খোলস থেকে বেরিয়ে এসে মুয়াবিয়া ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন। তিনি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় ও শাখাকে। পাঁচ) সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-কলা ও সংস্কৃতির জগতে শরিয়তী নীতির বৈপ্লবিক সংস্কারের সূচনা হয় মুয়াবিয়ার হাত ধরেই। গল্প, উপন্যাস ও কাব্য রচনা মুহাম্মদের অপছন্দ ছিল এবং খেলা-ধুলাও ছিল অপছন্দের তালিকাভুক্ত। গান-বাজনা এবং ছবি আঁকা তো ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় পাপ ও অপরাধ। এসব ক্ষেত্রে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের নীতি নেওয়া হয়েছিল। (ছয়) ইসলামী নীতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন মুয়াবিয়া সেই কাজ আরও বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর পরের খলিফাগণ। মুয়াবিয়া ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিনিধি। উমাইয়া যুগের পর আব্বাসীয় যুগের দশম শতাব্দী পর্যন্ত সেই সংস্কার প্রক্রিয়া ছিল বেশ সাবলীল, প্রাণবন্ত ও গতিশীল। তারপরই হোঁচট খেতে খেতে এক সময় দ্বাদশ শতাব্দীতে একদম থেমে যায়। সংস্কার প্রক্রিয়ার একটা পর্বে খলিফাগণ 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'-এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে "মুত্তাজিলা" নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে, মানুষের যুক্তিভিত্তিক চিন্তার ফসলগুলি কোরানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে খলিফার উপদেষ্টামণ্ডলীতে সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে দেওয়া হয়েছিল মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতাদের, এবং তাঁদের পরিবর্তে উপদেষ্টামণ্ডলীর শোভা বর্ধন করতেন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প-কলা ও সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ। বলা বাহুল্য যে,

এইসব নক্ষত্রদের নির্বাচনের সময় তাঁদের মেধা ও পাণ্ডিত্যই বিচার্য ছিল, ধর্ম-পরিচয় নয়। সাত) রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এইসব বৈপ্লবিক সংস্কার ছাড়াও সেই সময় শরিয়তী নারী-নীতিতেও ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছিল। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের নারী যে অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতো সেগুলি সবই হরণ করে নিয়েছিল ইসলাম। ইসলাম এসে নারীকে গৃহবন্দী ও হিযাববন্দী করে পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছিল। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে খলিফাগণ নারীকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং দিয়েছিল অনেক স্বাধীনতা, অধিকার ও সম্মান। সেই সময় নারী কীরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতো তা বোঝার জন্যে দু/তিনটি দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। ঐতিহাসিক ফিলিপ. কে. হিট্টি লিখেছেন, 'এক সময় মারওয়ানি আমলে মদীনার মানুষ গর্ব করতেন হুসাইনের সুন্দরী কন্যা সায়িদাহ সুকাইনার (মৃত্যু-৭৩৫) জন্য। তিনি ছিলেন মুসলিম আমলের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জনকারী মহিলা, আলীর নাতনি।'

সুকাইনার শিক্ষা-দীক্ষা এবং সঙ্গীত-কবিতায় আগ্রহ, তাঁর রুচি-সংস্কৃতি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। দ্রুত তিনি সৌন্দর্য, সাহিত্য এবং ফ্যাশনের এক নম্বর স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। ... এই মহিলার বাড়িতে তখনকার দিনের সেরা কবি এবং বিচারকদের সম্মিলন হত। রীতিমতো বৈঠকখানা ছিল সেটি। ... সুকাইনা দীর্ঘকাল বা কিছুকালের জন্য যে সব স্বামীর সঙ্গে ঘর করেছেন তাঁদের সংখ্যা গুণতে গেলে দুহাতের আঙুলেও শেষ হবে না। ... তিনি বিবাহের আগেই পূর্ণ-সম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা অপরিহার্য মনে করতেন।' (দ্রঃ- আরব জাতির ইতিহাস, পৃ-২২৬)। আব্বাসীয় খলিফা হারুণ-আল-রশীদের (৭৮৬-৮০৯) খেলাফত কালে বাগদাদ খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেছিল। সে সময় নারী কীরূপ স্বাধীনতা ও সম্মানের অধিকারী ছিল তা জানা যায় এই ঘটনা থেকে—'খলিফার বিবি যুবাইদাহ (যিনি সম্পর্কে তাঁর চাচাতো বোন ছিলেন) স্বামীর সঙ্গে যাবতীয় কাজকর্মে অংশীদার ছিলেন। ... বিবি যুবাইদাহ অত্যন্ত ফ্যাশন প্রেমিক ছিলেন। তিনিই প্রথম আরবী মহিলা যিনি জুতোয় দামী মণিমুক্তো লাগান।' (উদ্ধৃতি, সূত্র-ঐ, পৃ-২৮৮)। নারী কীরূপ অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতো তা বোঝাতে গিয়ে হিট্টি আগানিকে উদ্ধৃত করে আরও লিখেছেন, 'সাবেক আব্বাসীয় মহিলারা উমাইয়া মহিলাদের মতোই স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতেন। ... আমরা তৎকালীন উচ্চ মহলের মহিলাদের উঁচু পদে থেকে প্রভূত ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা জেনেছি। প্রশাসনে তাঁদের দাপট ছিল সর্বজনবিদিত। আল খায়জুরান, আল-মাহদীর স্ত্রী এবং আল-রশীদের মা এমনই মহিলা ছিলেন। আল-মাহদীর কন্যা উলাইয়া, আর-রশীদের স্ত্রী এবং আল-আমীনের মা যুবাইদাহ এবং আল-মামুনের স্ত্রী বুরান—এঁরা সবাই যুদ্ধে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা থেকে শুরু করে কবিতা লেখা এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষেত্রে এঁদের জুড়ি ছিল না। সঙ্গীত প্রতিভা এবং বাগ্মীতায় এঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন।' (সূত্র-ঐ, পৃ-৩১৯)।

দশম শতাব্দী থেকে সেই সংস্কার প্রক্রিয়া হোঁচট খেতে শুরু করে। ধীরে ধীরে শরিয়তের ছায়া বিস্তার করতে শুরু করে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ আব্বাসীয় খেলাফত কালেই আরবরা

তথা ইসলামী সাম্রাজ্য পুনরায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে শরিয়তী শাসনেই। মুত্তাজিলা নীতির সাথেই বিদায় করে দেওয়া হয় খলিফার উপদেষ্টামণ্ডলী থেকে সকল জ্ঞান-তাপস পণ্ডিত ব্যক্তিদের। পুনরায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে পুনস্থাপিত করা হয় এবং উপদেষ্টামণ্ডলীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় কোরান ও হাদিস বিশেষজ্ঞ ধর্মীয় নেতাদের।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে যতদিন রাষ্ট্র ও সাধারণ সমাজ জীবনে সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল, ততদিনই আরবদের ও ইসলামী সাম্রাজ্যের উন্নতি ও বিকাশও অব্যাহত ছিল। খলিফারা যেমনই ফিরে গেলেন সেই শরিয়তী শাসনে এবং ঘোষণা করলেন কোরানের ওপর কোন কথা চলবে না, তেমনই স্তব্ধ হতে শুরু করল আরবদের উন্নতি ও অগ্রগতির সকল ধারা। অগ্রগতির বদলে শুরু হলো পশ্চাদযাত্রা। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং গোঁড়া উলামার (ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) কাছে খলিফাদের আত্মসমর্পণের কারণেই আরবদের উন্নতির চাকা থেমে গিয়েছিল সে কথা মানেন মুসলিম ঐতিহাসিকগণও। এ প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ওসমান গণির মত শোনা যাক্। তিনি বলছেন, 'সমাজের বদ্ধ সংস্কার, কুসংস্কার, অপসংস্কার, অন্ধ অনুশাসন-অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকাটা একেবারেই নিবুর্দ্ধিতার পরিচয়। একটি জাতির অস্থি ও মজ্জাকে অসাড় করে তুলতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত চেতনার অনুপস্থিতির যে প্রভাব, মুসলিম জাহান দশম খ্রিস্টাব্দের পর তা হতে আর নিষ্কৃতি লাভ করেনি। ... বাগদাদ খলিফাগণ অনেক পূর্বেই স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার সমাধি রচনা করেছিলেন। তবুও খেলাফত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ১০০০ খ্রিঃ হতে ১২৫৮ পর্যন্ত এসেছিল। এই সমস্ত খলিফাগণ চালিত হয়েছিলেন কিছু ধর্মান্ধ মোল্লা দ্বারা।' (সূত্র:-মুসলিম সমাজ এবং এই সময়, সম্পাদনা : মইনুল হাসান, পৃ:-১৬০, ১৬১)। হ্যাঁ, শুধু উন্নতি ও অগ্রগতির সকল ধারা থেমেই যায়নি আরবদের, শরিয়তে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র একশ বছরের সামান্য অধিক কাল পর্যন্ত টিকে ছিল খেলাফততন্ত্র তথা ইসলামী সাম্রাজ্য এবং ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত খেলাফত ও আরবদের আধিপত্যের অবসান ঘটে।

শরিয়তী রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমাগত সংস্কার সাধন প্রক্রিয়া এবং অশরিয়তী রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন থেকে শরিয়তে প্রত্যাবর্তনের উল্টো প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তা হলো এরূপ : এক) শরিয়তী সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমাগত সংস্কার সাধন এবং এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে অশরিয়তী সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রবর্তন আরবদের পক্ষে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই আশীর্বাদ হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দলে। তারাই এক সময় (৮ম-১০ম শতাব্দী) বিশ্বের সকল দেশ ও জাতিকে পশ্চাতে ফেলে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এবং সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতিতে সবচেয়ে অধিক অবদান রেখেছিল ঐ আরবরাই। এই বিস্ময়কর সাফল্য তারা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল শরিয়তী সমাজ অবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করেই। অপরদিকে পুনরায় শরিয়তী সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ফলে পরিণতি ঘটেছিল ঠিক তার উল্টো। উন্নতির সকল প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায় এবং আরবরা পশ্চাৎগামী হতে শুরু করে। সেই পশ্চাৎগামিতা

রয়েছে আজও অব্যাহত। বাকী বিশ্বের মুসলমানদেরও অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই পশ্চাৎপদতা ও পশ্চাৎগামিতাই। কারণ সবাই ঐ আরবদেরই অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছে। দুই) বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে খলিফাগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে শরীয়তী আইন-কানুনের সংস্কার অপরিহার্য। এই অপরিহার্যতাই তাঁদের বাধ্য করেছিল সংস্কারের কর্মসূচী হাতে নিতে। সুতরাং এটা সংশয়াতীত ঘটনা যে প্রতিটি সংস্কারের পশ্চাতে ছিল তাঁদের গভীর পর্যবেক্ষণ, পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ভাবনা-চিন্তা এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী। অপরদিকে এটাও সংশয়াতীত যে, শরীয়তে প্রত্যাবর্তনের পশ্চাতে কোন প্রকার যুক্তিভিত্তিক ভাবনা-চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা ছিল না। ছিল কেবল আবেগ ও অন্ধ বিশ্বাস।

মোল্লা সমাজ এবং তাঁদের দোসর মুসলিম সমাজের বাচাল বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেন যে শরীয়তী আইনের সংস্কারের কোনরূপ আবশ্যকতা নেই, কারণ কোরান একটি অভ্রান্ত, চিরশ্রেষ্ঠ ও চির-প্রাসঙ্গিক মহা সংবিধান। কিন্তু উপরের আলোচনায় যে ছবি উঠে এসেছে তাতে স্পষ্টতঃই ধরা পড়েছে যে সেই দাবিটি স্রেফ একটি গালগল্প, যার কোন বাস্তব ও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এই ছবিটি মোল্লা সমাজের ভিত্তিহীন দাবির পশ্চাতে আড়ালে থাকা একটি নির্মম ও কঠিন সত্যকেও সামনে টেনে নিয়ে এসেছে যেটা হলো, শরিয়তী আইনের সীমাবদ্ধতা। বহু ত্রুটি ও বহুক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্যতা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই নগ্নভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

উপরের আলোচনায় আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে যা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে শরিয়তী আইনে মুসলিম সমাজ মোটেই স্বাচ্ছন্দে ও স্বস্তিতে নেই। শরিয়তী আইন ও তৎজনিত ফতোয়ার সঙ্গে মুসলিম সমাজের দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বগুলি সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করছে কিংবা বিস্ফোরণের আকার নিচ্ছে। এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ঘটনাগুলির সংখ্যা যে ক্রমবর্ধমান তা বলা বাহুল্য। এসব ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে শরিয়তী আইন-কানুনের মধ্যে মুসলিম সমাজ রয়েছে দমবন্ধকর অবস্থায়, তারা মুক্ত বাতাসের প্রবল অভাব বোধ করছে এবং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছে।

শরিয়তী সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মুসলিম সমাজের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব ও সংঘাতগুলি অন্য একটি বার্তাও বহন করে। তা হলো, মুসলিম সমাজের সংস্কার কেবল আবশ্যক তাই নয়, এটা অতিশয় জরুরী হয়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই উপলব্ধি কি মুসলিম সমাজ অনুভব করছে? অবশ্যই করছে। মুসলিম সমাজের একাংশে এ উপলব্ধি আছে এবং এটা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এ যুগেও বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, তালাক, ফারাজ প্রভৃতি পশ্চাৎপদ শরিয়তী আইনগুলিকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ আইন জ্ঞানে মুসলিমরা সবাই সমর্থন ও শ্রদ্ধা করে এমন ধারণা ভীষণ সরল ও অগভীর ভাবনা প্রসুত। নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা, কিংবা মুল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রাখার ন্যায় নারীকে পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকানোর জন্যে এক টুকরো কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃত করে রাখার 'হিযাব' আইন যে ৯০/৯৫ শতাংশ মুসলমানই বর্জন করেছে সে তো প্রকাশ্যেই দৃশ্যমান। নারী বিষয়ক এই আইনগুলি কেবল নারীর পক্ষে অবমাননাকরই নয়, এগুলি মুসলিম সমাজের উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে বড় ও প্রধান প্রতিবন্ধকও। কারণ এর ফলে মুসলিম

নারী উপার্জন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অক্ষম। দারিদ্রপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট মুসলিম সমাজ বিপুল নারীশক্তির এই সম্পূর্ণ অপচয়কে মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা ও সমর্থন করে এমন ধারণাও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সুতরাং মুসলিম সমাজে সংস্কারের আবশ্যকতা সম্পর্কে উপলব্ধি যে রয়েছে এবং তার মাত্রা ও ব্যাপ্তি যে ক্রমবর্ধমান তা সংশয়ের উর্ধ্বে।

এতদ সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ সংস্কারের দাবি মুসলিম সমাজ থেকে আজও সেভাবে ওঠেনি। এই দাবি না ওঠার ফলে জনমানসে একটা ধারণার জন্ম হয়েছে যে গোটা মুসলিম সমাজটাই পশ্চাৎপদ শরিয়তী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আজও সমান শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল। কিন্তু এই ধারণাটি নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্ত। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মুসলিম সমাজের ভিতর থেকে সমাজ সংস্কারের দাবি উঠছে না কেন? এর উত্তর হলো, ভয়। একমাত্র ভয়েই কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চায় না। ভয় মোল্লা সমাজকে যাঁদের সঙ্গে রয়েছে তাঁদের মতো একদল ধর্মান্ধ ও গোঁড়া মুসলমান। এই মোল্লা সমাজ ও তাঁদের অনুগামীরা ভীষণ অসহিষ্ণু, হঠকারী, উগ্র, নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। শরিয়তের সামান্য সমালোচনাতেই তাঁরা অস্থির, চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সমাজ সংস্কারের কথা বলা মোল্লাদের বিচারে অমার্জনীয় ও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এরূপ দাবি যাঁরা করবেন শরিয়তের বিচারে তাঁরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। মুহাম্মদের নির্দেশ বা বিধান হলো, মুরতাদকে ক্ষমা নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে। যুগে যুগে কত মানুষ যে এই বিধানের বলি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই যুগেও মোল্লা সমাজ ও তাঁদের অনুগামীদের হাতে মুসলিম সমাজের যুক্তিবাদী মানুষদের সমানে নিগৃহীত হতে হয়। হতে হয় নির্বাসিত এবং খুনও। এই নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক দমন-পীড়নমূলক শাস্তির ঘটনাগুলি যে প্রকাশ্যেই সংঘটিত হয় তা বলা বাহুল্য। ফলে মুসলিম সমাজে সর্বদা বিরাজ করে একটা ভয় ও আতঙ্কের আবহ। এই ভয়ই স্তব্ধ করে রেখেছে মুসলিম সমাজের সংস্কারের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। এটাও একটি বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা-সম্পর্কিত বিষয়। মোল্লা সমাজ যখন কুৎসিত ও ভয়াবহ ফতোয়াগুলি জারি করেন এবং একদল ধর্মান্ধ মুসলমান যখন সেগুলি কার্যকর করতে তৎপর হয়ে ওঠে ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে কার্যকর করে তখন তার বিরুদ্ধে কার্যত কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না। এর জন্যে দুটি ধারণার জন্ম হয়—এক) সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের ঐসব ফতোয়ার প্রতি অনুমোদন রয়েছে। এবং দুই) মোল্লা সমাজ ভীষণ পরাক্রমশালী এবং তাঁদের এই পরাক্রমের উৎস হলো মুসলিম সমাজ। এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। কুৎসিত ও বর্বরোচিত ফতোয়া ও তার নৃশংস রূপায়ণের ঘটনাগুলি মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশই অনুমোদন ও সমর্থন করে না। বরং এসব ঘটনায় তারা ভীষণ বিব্রত বোধ করে এবং তাদের মধ্যে বিরক্তি, অসন্তোষ ও ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তারা যেহেতু অসংগঠিত তাই ভয়ে সংযত থাকে এবং প্রতিবাদে সরব হতে পারে না। অন্য ভ্রান্ত ধারণাটি (মোল্লা সমাজ ভীষণ পরাক্রমশালী এবং তাদের পরাক্রমের প্রধান উৎস মুসলমান সমাজ) ভ্রান্ত এবং প্রকৃত ঘটনা হলো মোল্লা সমাজকে যতটা পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাশালী দেখায় ওঁদের পরাক্রম ও ক্ষমতা মোটেই তত নয়। এবং যেটুকু

ক্ষমতা ওঁদের রয়েছে তার প্রধান উৎস রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। না, এটা মোল্লা সমাজের শক্তিকে খাটো করে দেখার স্বপ্নবিলাস নয়, এটাই বাস্তব ঘটনা এবং এই বাস্তব সত্যিটি বোঝা যায় দু ধরনের ঘটনা প্রবাহ থেকে। এক) ফতোয়াবাজ মোল্লা সমাজের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ও অমানবিক ফতোয়ার যাঁরা শিকার হন তাঁদের মধ্যে অনেককেই দেখা গেছে ফতোয়ার প্রতিবাদ ও অগ্রাহ্য করতে। সে সময় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও নৈতিক কর্তব্য হলো ফতোয়ার শিকার ও বিপন্ন ঐ ব্যক্তিটির পাশে দাঁড়ানো ও তাঁকে সুরক্ষা প্রদান করা, এবং বেআইনি ফতোয়া ও ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে আইনি ও কঠিন পদক্ষেপ করা। কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক তার বিপরীত ভূমিকা সম্পাদন করে। রাষ্ট্র বিপন্ন মানুষটিকে সুরক্ষা প্রদান তো করেই না, বরং মোল্লাদের প্রদত্ত ফতোয়ার বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যে তিরস্কার করে মোল্লাদের কাছেই ফিরে যেতে পরামর্শ প্রদান করে। ফলে ফতোয়া-পীড়িত অসহায় মানুষটি মোল্লাদের পদতলেই আত্মসমর্পণ করে। দুই) মুসলিম সমাজের যুক্তিবাদী মানুষদের কেউ শরিয়তী আইন-কানুনের সমালোচনা করার সাহস প্রদর্শন করলে তার পরিণতি কী হয় তা তো সর্বজনবিদিত। তাঁর উপর ধর্মান্ধ মোল্লাদের দল ও তাঁদের ধর্মান্ধ অনুরাগীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্রভাবে। তাঁর ওপর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া জারি করা হয় এবং সেই ফতোয়া কার্যকর করার জন্যে মোল্লাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র একটি মুসলিম-বাহিনী তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়, তাঁর বাড়ী খানা-তল্লাশি করে, এবং তাঁকে না পেলে তাঁর বাড়ীর লোকজনের ওপর চড়াও হয় ও বাড়ীর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। এসব সন্ত্রাসমূলক কাজ প্রকাশ্যেই ঘটে। এই সময়ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নীরব থাকে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুরক্ষা প্রদান করার পরিবর্তে উল্টে ফতোয়াবাজ মোল্লাদেরই মদত প্রদান করে, এই কথা বলে যে বাক স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা সমর্থন করা যায় না। এর জন্যেই মোল্লা সমাজ যেমন একদিকে ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তেমনই অপরদিকে তাঁদের যেটুকু প্রকৃত শক্তি ও ক্ষমতা তার চেয়ে নিজেদের অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ভাবে এবং অপরাজেয় মনে করে। রাষ্ট্র কর্তৃক এরূপ ভূমিকা পালনের ঘটনা ঘটে সমগ্র প্রাচ্য জুড়েই। রাষ্ট্র যখন এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে তখন অনুরূপ ভূমিকা নেয় সকল রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও। কী শাসক কী বিরোধী, কিংবা কী দক্ষিণপন্থী কী বামপন্থী, সব দল ও সব নেতাগণই এক্ষেত্রে একই পথের পথিক। পাছে মুসলিম ভোট বিপক্ষে যায় এই ভয়ে সবাই নির্লজ্জের মত প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা সমাজের পদলেহনে ব্যস্ত ও মত্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির এই লজ্জাজনক ভূমিকা একদিকে মোল্লা সমাজকে ক্ষমতাবান করে তুলেছে, এবং অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে যারা পরিবর্তনকামী তাদেরকে ভীত ও দুর্বল করে দিচ্ছে। অমুসলিম সমাজের ভূমিকাও হতাশাব্যাঞ্জক। মোল্লা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কোন প্রতিবাদ সেখান থেকেও আসে না। সাধারণ মুসলমান কিংবা মুসলিম সমাজের কোন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ওপর মোল্লা সমাজের শরিয়তী নির্যাতন যতই অমানবিক কিংবা পৈশাচিক হোক না কেন কোনো প্রতিবাদ শোনা যায় না, ওটা মুসলমানদের ব্যাপার বলে প্রায় সবাই দায় এড়িয়ে যায় ও নীরব থাকে। ভারতের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সমাজের এই দুঃখজনক নীরব ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকাও মোল্লা সমাজের হাতকে শক্তিশালী করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও মদত ব্যতীত মুসলিম সমাজের ওপর মোল্লা সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব এতদিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। মুসলিম সমাজের সংস্কারের প্রশ্নে তাই একথাটিও মনে রাখা আবশ্যক যে এই কাজে একমাত্র বাধা কেবল সংগঠিত মোল্লা সমাজই নয়, মূর্তিমান বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি ও এ যুগের অধঃপতিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিও। তাই মুসলিম সমাজে সংস্কারের কাজটি বোধহয় এ যুগের সবচাইতে কঠিন কাজ। কাজটি যে অতিশয় কঠিন তা সন্দেহাতীত, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে শরিয়তের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করছে ও দানা বাঁধছে। সমাজ বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও প্রবাহ শ্লথ ও প্রলম্বিত করা সম্ভব কিন্তু চিররুদ্ধ করা অসম্ভব।

তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত' গ্রন্থের সমর্থনে লেখা ৬ অক্টোবর ২০০৫ দৈনিক স্টেটসম্যানে গিয়াসুদ্দিনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "সেই প্রবন্ধটিতে হজরত মহম্মদের ব্যক্তিজীবনের কিছু কথার উল্লেখ প্রাসঙ্গিকভাবেই করা হয়েছে। যে কথাগুলি লেখা আছে তা অপ্রিয় হলেও সত্য। সেটা হজম হয়নি মৌলানা সমাজের। সমাজকে আমার বিরুদ্ধে খ্যাপাতে হবে। তাই আমার বিরুদ্ধে ওরা অপপ্রচার শুরু করেছে। ওরা প্রচার করছে বিজেপি আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছে এসব লেখার জন্য। এসব অপপ্রচারে স্বভাবতই বহু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়েছে আমার ওপর। সেই ক্ষিপ্ত মানুষকে ডেকে মৌলানারা গত ১১ ও ১২ তারিখে আমার বিরুদ্ধে জনসভা করেছে। সেই সভা থেকে ওরা ফতোয়া দিয়েছে : আমি মুরতাদ, আমি মুসলমানদের শত্রু, আমাকে হত্যা করে আমার তথাকথিত অন্যায়ের শাস্তি দিতে হবে। একজন হাজি, যার তিনটি স্ত্রী বর্তমান, তিনি বলেছেন, কাউকে লাগবে না আমরা বাপ বেটাই কাফি, আমরাই গিয়ে গিয়াসের গর্দান নেব। আর আপনারা যদি গিয়াসের গর্দান নিতে পারেন তবে দু'লাখ, পাঁচ লাখ, যত টাকা লাগবে আমি দেব। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন একজন মুফতি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাঁচ বছর খেতে দেননি এবং তালাক দিতে চেয়েছিলেন। আমি ওঁর স্ত্রীর পক্ষে জোরাল লড়াই করেছি এবং বাধ্য করেছি স্ত্রীকে নিয়ে যেতে।"

— গিয়াসুদ্দিন

উত্তর ২৪ পরগনার ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেলের পক্ষে শ্রীসৌম্যজ্যোতি রায় এবং অ্যাডভোকেট শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বারাসাত জাজেস কোর্ট, কলকাতা ৭০০১২৪ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত। প্রচারে— সর্বশ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, চঞ্চল দেবনাথ, জ্যোতির্ময় পোদ্দার এবং সুজিত কুমার সিকদার। যোগাযোগ: ৯৮৩০৯৯৬৫৬৬ এবং ৯১৬৩১২২২১১

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র